দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

জাতির জাগরণে
নবদ্বীপের সিংহপুরুষ
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
— পৃঃ ১৯

নোবেলজয়ী ড. ইউনুসের
হাত ধরে বাংলাদেশ
তালিবানি শাসনের দিকে
ধাবমান — পৃঃ ১৩

৭৭ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ৬ জানুয়ারি, ২০২৫।। ২১ পৌষ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ২১ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৬ জানুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

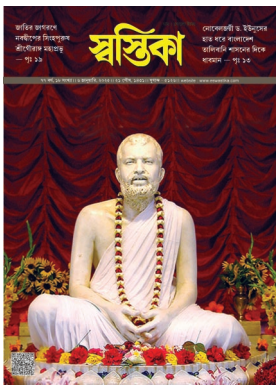

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

মমতার মুসলিম মুখরাই কি তার মুখ পোড়াবে?

জঙ্গিবঙ্গের রান্নাঘরে তোষণ পোষণ

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

তৃণমূলের আদর্শ ও লক্ষ্য কী? ভয়ংকর প্রশ্ন

☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতকেও শক্ত হাতে লাগাম ধরতে হবে ☐ চেতন ভগত ☐ ৮

মগজেও চাই পুষ্টিকর ভাবনাচিন্তা ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ১০

সব হারিয়ে চৈতন্যোদয় হলো হাসিনার : মমতা ব্যানার্জি কি শিক্ষা নেবেন? ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১১

নোবেলজয়ী ড. ইউনুসের হাত ধরে বাংলাদেশ তালিবানি শাসনের দিকে ধাবমান ☐ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ☐ ১৩

পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা দেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দুঃখ, আবেগ কতটুকু? ☐ অমিত কুমার চৌধুরী ☐ ১৫

পশ্চিমবঙ্গ কি ইসলামি শাসনের পথে

☐ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ☐ ১৭

জাতির জাগরণে নবদ্বীপের সিংহপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

☐ অর্ণব দাস ☐ ১৯

জগদ্‌গুরু সেদিন কল্পতরু, খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে সনাতনীর স্রোত ☐ বিদ্যুৎ মুখার্জী ☐ ২৩

মহাপ্রভু অধ্যাত্মরাজ্যে প্রথম গণতন্ত্রের পূজারি

☐ ড. সর্বাণী চক্রবর্তী ☐ ২৪

জাতির চৈতন্য জাগরণে সাধুসন্তদের ভূমিকা অনন্য

☐ রাজদীপ মিশ্র ☐ ২৬

কল্পতরু : কথা ও কাহিনি ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

না-মানুষ, না-প্রাণের নিরন্তর শক্তি চেতনার থেকে মানুষ পাক চৈতন্যের সন্ধান ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ৩৫

বাংলাদেশের ছাত্র যুব আন্দোলন আজ কলঙ্কিত

☐ চন্দন রায় ☐ ৩৭

মন্থনের মাধ্যমে অমৃত উৎপন্ন করে সমাজকে প্রদান করা আমাদের কাজ : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ☐ ৪৩

শুদ্ধি আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী

☐ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৮-২৯** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐ **স্মরণে : ৪৯** ☐ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০**

প্রকাশিত হবে ১৩ জানুয়ারি ২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৩ জানুয়ারি ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিবেকবোধ

স্বামী বিবেকানন্দ হলেন শাশ্বত ভারতের জাগ্রত বিবেক। যুগ-যুগান্তরে ঈশ্বরকল্প পুরুষদের আবির্ভাবে দেশবাসীর বিবেকবোধ হয়েছে জাগরিত। ধর্মের গ্লানি, সামাজিক অবক্ষয়কে জয় করে দেশ ও জাতির বুকে নতুন রূপে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে বারবার। স্বামীজী প্রদত্ত উপদেশ ও চেতনাকে পাথেয় করে আগামীদিনে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের বিবেকবোধ জাগরণ অবশ্যম্ভাবী।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০/- + ৩৬০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০/- + ৮৫০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালির চৈতন্যোদয়

ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে যুগে যুগে এই পবিত্রভূমিতে অবতার-পুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া জাতিকে পথনির্দেশ করিয়াছেন। ধ্বংসের হাত হইতে এই ভূমি ও জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। এই ভূমিতে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে, তখন তখন তিনি আবির্ভূত হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্টদের বিনাশ করিবেন। সেই অঙ্গীকার তিনি পালন করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত ঈশ্বরকল্প পুরুষগণও সময়ের প্রয়োজনে আবির্ভূত হইয়া অবতারগণের ন্যায়ই জাতিকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার ফলে বহু ঘাত-প্রতিঘাতেও হিন্দুজাতি বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। বরং তাহারা প্রাণশক্তিতে ভরপুর হইয়া ক্রমাগত দেশ, ধর্ম, জাতির বিকাশ সাধন করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর হইয়াছে। ইহার জন্যই সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্ম অতি পুরাতন হইলেও নিত্যনূতন ও যুগোপযোগী। এই কারণেই সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মকে মানবধর্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ যেইরূপ মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ মধ্যযুগে আদি শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় মহাপুরুষগণ সেই ধারাই অব্যাহত রাখিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে শঙ্করাচার্য ব্যতীত রামানুজাচার্য, নারায়ণ গুরু, চেম্বতি শ্রীধরলু, কান্দুকুরি বীরেসলিঙ্গম, আলবার, নায়নার; ওড়িশায় মহিমা গোঁসাই, ভীমা ভোই; মহারাষ্ট্রে সন্ত জ্ঞানেশ্বর, সাধক তুকারাম, সমর্থ স্বামী রামদাস, সন্ত একনাথ, জ্যোতিরাও ফুলে; পঞ্জাবে গুরু নানকদেব, স্বামী রামতীর্থ; গুজরাটে দয়ানন্দ সরস্বতী, উত্তর ভারতে সুরদাস, তুলসীদাস, রামানন্দ, ভক্ত কবীর, রবিদাস; অসমে শঙ্করদেব উল্লেখযোগ্য। ভারতবাসীর সহিত বঙ্গবাসীর সৌভাগ্য যে বঙ্গভূমির ঈশ্বরকল্প পুরুষগণ শুধুমাত্র বঙ্গভূমি অথবা বাঙ্গালির চৈতন্য জাগরণ ঘটান নাই, সমগ্র ভারতবাসীকে তাঁহারা পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ঘোর মধ্যযুগে বিধর্মীদের অত্যাচারী শাসনের মধ্যেও শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালি জাতিকে সম্যক বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বঙ্গভূমিতে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হইত না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। আধুনিক যুগে বাঙ্গালির ত্রাতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহারই ত্যাগী শিষ্যগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতোদ্ধারে জীবনপাত করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি নিদ্রিত ভারতবাসীকে জাগ্রত করিবার অসাধ্য কার্যটি করিয়া দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করিয়াছেন। বর্তমানে বঙ্গবাসীর এই ঘোর দুর্দিনে যতটুকু জাগরণ লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহা ঈশ্বরপ্রেরিত কয়েকজন সাধুসন্তের কারণেই।

বাঙ্গালি জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর, স্বামী প্রণবানন্দ, হরিচাঁদ ঠাকুর-সহ বহু ঈশ্বরকল্প পুরুষের কর্মময় জীবনের উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ বিজাতীয় বৈদেশিক মতাদর্শ, বিধর্মীদের আস্ফালন এই ভূমির জীবনকে বিঘ্নিত করিতেছে। ইহার কারণ হিসাবে বলা যায়, বাঙ্গালি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'সঙ্ঘে শক্তি কলৌ যুগে' অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতি, ধর্ম, সমাজ ও দেশ রক্ষা করিবার কথা বিস্মিত হইয়াছে। তাঁহাকে শুধুমাত্র প্রেমের অবতার মনে করিয়া পূজার আসনে বসাইয়া উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছে। স্বধর্ম, স্বজাতি রক্ষার সাধনাকে উপেক্ষা করিয়াছে। দেশ, জাতি, ধর্ম রক্ষার্থে স্বামী বিবেকানন্দের সিংহগর্জনও বাঙ্গালি ভুলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুষ্টিমেয় বাঙ্গালির স্বাভিমানশূন্যতার কারণে সমগ্র বাঙ্গালি জাতিই দেশ তথা বিশ্বের নিন্দাভাজনে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালির চৈতন্য লুপ্ত হয় নাই তাহার কারণ হইল তাহাদের আরাধ্য ঠাকুর শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ-সহ অজস্র মহাপুরুষের আশীর্বাদ তাহাদের মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই বাণী অদ্যাবধি পরম্পরাগতভাবে বহন করিয়া চলিয়াছেন কতিপয় সিংহপুরুষ সন্ন্যাসী। তাই বাঙ্গালি মরিতে মরিতেও বাঁচিতেছে। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজ শত অত্যাচারেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া স্বধর্ম রক্ষার লড়াই করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের আপাত বিভ্রান্ত হিন্দুদিগেরও সংবিৎ ফিরিতেছে। জাতির বোধোদয় ঘটিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাক্য 'তোমাদের চৈতন্য হউক' ইথারতরঙ্গে তো রহিয়াছে। চৈতন্য লাভে ইহাই বাঙ্গালির পক্ষে যথেষ্ট।

সুভাষিতম্

কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্।।
চরৈবেতি চরৈবেতি.... (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,৭।১৫।৪)

কলিযুগের লক্ষণ নিদ্রিত থাকা, নিদ্রাভঙ্গ দ্বাপরযুগের লক্ষণ, উঠে দাঁড়ানো ত্রেতাযুগের লক্ষণ এবং সত্যযুগের লক্ষণ চলতে থাকা। তাই চলতে থাকো, চলতে থাকো।

মমতার মুসলিম মুখরাই কি তার মুখ পোড়াবে?

জঙ্গিবঙ্গের রান্নাঘরে তোষণ পোষণ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

নতুন করে বলার দরকার নেই পশ্চিমবঙ্গ ইসলামি জঙ্গিদের ঘরবাড়ি। সব তথ্যের সমাহার করলেও তা কম হবে। মোল্লাবাদী অত্যাচারের সংখ্যা মহাভারতের লক্ষ শ্লোককেও অতিক্রম করবে। রাজ্যে জঙ্গি বৃদ্ধির হার প্রায় ঘামাচির মতো। তা মেরে গুনতে হয়। সনাতনী ভারতে বহু ইষ্টদেবতা। তাই সর্বদেব ভব হয়ে ওঠার শক্তি তার রয়েছে। দেশের চিন্তাধারক ব্যক্তিরা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনার মধ্যে শুদ্ধ সনাতন সংস্কৃতির একমেবদ্বিতীয়ম্ হয়ে ওঠার দুঃসাহস দেখাতে নিষেধ করেন। তার মর্মার্থ উদ্ধার সহজ নয়। বিভেদকামীদের মূর্খামিতেই তা ধরা পড়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য জঙ্গিদের রান্নাঘর হয়ে গিয়েছে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের বাড়ির একতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের দপ্তর ছিল। যেখানে বোমা বানানো হতো সেটা খারিজি বা বিচ্ছিন্ন মাদ্রাসা। মমতার দাবি ছিল ওটা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। রাজ্যের বুকে এই ধরনের কত বেআইনি মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে তার কোনো সংখ্যা কোনো সরকার দেয়নি।

১৯৯২ সালে ভারত আক্রমণকারীদের তৈরি ধাঁচা ভেঙে ফেলার পর এই খারিজিদের রমরমা বাড়তে থাকে। এ রাজ্যে মুসলমান ভোট সদাই বড়ো বালাই। মুসলমানদের ভোট পেতে তাই তাদের সব ধরনের অন্যায়কে মেনে নেওয়া আর মদত দেওয়ার রাজনীতি অনেকদিন থেকেই এখানে তৈরি হয়েছে। আমেরিকার প্রথম ইরাক আক্রমণের সময় রাজ্যের নির্দিষ্ট মুসলমান অধ্যুষিত জেলায় আর শহরের বিভিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাতে তৎকালীন সিপিএম চালিত বামফ্রন্ট 'উদ্দাম সাদ্দাম' স্ক্রিনপ্রিন্ট করা দামি পোস্টার মুড়ি মুড়কির মতো ছড়িয়ে দিয়েছিল। ২০১১-তে হেরে যাওয়ার বেলায় বামেদের সেই মুসলমান ভোট অনেকটাই সরে যায়। কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বামপন্থীরা নিজেদের 'হিন্দু বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ দল' বলে দাবি করে। এই ত্রিকোণ চক্রের পাকদণ্ডি ধরেই এই রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়ছে। সবাই মিলে জেহাদিদের অংশের পাপের ঘর আগলাচ্ছে। পাশের বাংলাদেশে বেআইনি মোল্লাবাদী সরকার তৈরি হওয়ার পর থেকে এই যে জঙ্গি সমাবেশ উলম্ফন দিয়েছে। মোল্লাবাদী হিন্দু নিধনকারী ওই সরকার স্বভাবসিদ্ধভাবেই ভারত সীমান্তের উপর তাদের বিস্তৃতি কায়েম করতে নজর রেখেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের সীমান্তগুলি ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের ইসলামিক সম্পর্কের সঙ্গে কংগ্রেস আর বিদেশি বামপন্থীদের মুসলমান তোষণ আর পোষণের মৌলিক ফারাক রয়েছে। কংগ্রেস আর বিদেশি বামেদের প্রাতিষ্ঠানিক তোষণ পোষণের থেকে তা আলাদা। তা ব্যক্তিগত। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমান সমাজ প্রয়োজনহীনভাবেই বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে। এটা সংবিধান আর দেশ

> "সার্বিকভাবে মমতা ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু ভিতরে স্ব-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ সুবিধামতো নিরপেক্ষ। মুসলমান ভোটের স্বার্থে অপেক্ষারত।"

বিরোধী। স্বাধীনতার পর থেকে ৬৪ বছর ধরে মুসলমানবাদী ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস আর বিদেশি বাম যে পরিমাণে মুসলমান ভোট ঘরে তুলত তার তুলনায় মমতা অনেক বেশি ভোট পান। মমতা আনুমানিক ৯২-৯৪ শতাংশ মুসলমান ভোট পান। রাজ্য জুড়ে ইসলামিক ভাবনা বজায় রাখতে মমতা ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরিতে জোর দেন। তিনি যে তাদের রক্ষাকর্তা তা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন।

আবার দুধেল গাই বলে তাদের অসম্মানও করেছেন। তবে ওই সম্প্রদায়ের কেউ তা গায়ে মাখে না। তৃণমূল এমন গাভি যাকে দোহন করেই তারা বেঁচে থাকে। ফলে তার পদাঘাত শিরোধার্য। অর্থাৎ বিষয়টি পারস্পরিক। ইদানীং শাসকের চ্যাংব্যাং-রা ধর্মবেত্তা সেজে বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক প্রচার করছেন। তা করতে গিয়ে কোনো বিধায়ক মমতা হিন্দু নারী হয়ে কতটা অনৈস্লামিক সে প্রশ্ন তুলছেন বা তুলতে দেওয়া হচ্ছে। তাতে মমতার মদত রয়েছে বলেই ধারণা হয়। রাজ্য ভোট যত এগোবে ইসলামিক ব্যাখ্যার অসঙ্গত তেজ তত বাড়বে। আশা করি সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহকরা যেন মমতার সেই কানা গলির সাজানো মোরগ লড়াইয়ের ঢঙে সতর্ক থাকেন। তোষণ পোষণের রাজনৈতিক ভ্রান্ত গলি পথে নিজেদের হারিয়ে না ফেলেন। তৃণমূল রাজনৈতিক দলের চেয়েও রাজনৈতিক ভাগবাঁটোয়ারার দপ্তর। সার্বিকভাবে মমতা ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু ভিতরে স্ব-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ সুবিধামতো নিরপেক্ষ। মুসলমান ভোটের স্বার্থে অপেক্ষারত। এই ভীষণরকমের হিংসুটে ভাবনার মধ্যেই মিশে রয়েছে তোষণ পোষণের রহস্যময় রাজনীতি যা বাঁচাতে মমতা সদা মরিয়া। কারণ সেটাই রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরা।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

তৃণমূলের আদর্শ ও লক্ষ্য কী? ভয়ংকর প্রশ্ন

দলনেত্রীযু দিদি,

আজ বছরের গোড়ায় আপনাকে একটা বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এ কথা বললে অনেকেই খুব রেগে যাবেন। 'গণতন্ত্র' মানে সেখানে, যেখানে সবার অধিকার সমান। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত দুর্নীতি এখন গণতন্ত্রায়িত। সবার অধিকার আছে দুর্নীতিতে, অবৈধ খাজনা আদায়ে— অন্তত তাদের, যাদের মাথায় শাসক দলের আশীর্বাদী হাত রয়েছে। বিগত জমানার সঙ্গে অথবা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মডেলের মূল পার্থক্য এই জায়গায়— পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির ব্যবস্থাটি বিকেন্দ্রিত, তার লোকাল-জোনাল-রাজ্য স্তরের হায়ারার্কি নেই। বড়ো জোর, আদায় করা খাজনার একটি অংশ যথাস্থানে প্রণামি দিতে হয়, বাকি অংশের উপরে একচ্ছত্র অধিকার। না দিদি, এটা আমার কথা নয়, আগেই বলেছি যে অনেকে বলেন। খুব যে ভুল বলেন, তা অবশ্য নয়।

রাজ্যের অনাচেকানাচে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন মাপের মনসবদার— তাদের মধ্যে কারও দখলে নদীর বালি, কারও সাম্রাজ্য নোনা জলের ভেড়িতে বিস্তৃত, কেউ রেশনের চালের চোরাকারবারি, কারও খাজনা আদায়ের ক্ষেত্র সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস, কেউ আবার হাসপাতালে রাজত্ব চালায়। খেয়াল করে দেখলে বোঝা যাবে, সাম্প্রতিক সময়ে এই মনসবদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে জনরোষ সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু একদিকে যেমন কেউ একটা দুর্নীতির সঙ্গে অন্য দুর্নীতির অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রটির দিকে ইঙ্গিত করেননি, ঠিক এমনই এই বিপুল জনরোষও কমাতে পারেনি এদের প্রতি শাসক দলের শীর্ষ স্তরের প্রশ্রয়ের পরিমাণ। এটাও আমার কথা নয় দিদি। সত্যি বলছি, যা শুনি তাই লিখেছি।

পূর্ববর্তী বাম জমানায় দুর্নীতি বা আইনহীনতা কি ছিল না? অবশ্যই ছিল। অন্য কোনো রাজ্যে আইনহীনতা নেই, এমন দাবিও করার কোনো মানে নেই। অতীতের পশ্চিমবঙ্গ বা বর্তমানে অবশিষ্ট ভারতের দুর্নীতির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি- আইনহীনতা কম না বেশি, এই প্রশ্নেরও কোনো বস্তুনিষ্ঠ উত্তর দেওয়া যাবে না। বরং বলা ভালো, এরাজ্য এখন এরাজ্যেরই মতো। আর কিছু না থাক দুর্নীতি আছেই। দিদি, তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শগত অবস্থানটা ঠিক কী, এই প্রশ্ন করলে ঘোর সমর্থকেরও মাথা চুলকানো ছাড়া উপায় থাকবে না। দিদি, আপনি কি বুঝিয়ে বলে দিতে পারবেন? আগেও জানতে চেয়েছি। কিন্তু উত্তর পাইনি। বিরোধী থাকাকালীন অন্তত সিপিএমের শাসনের অবসান ঘটানোর একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল আপনার দলের। কিন্তু ২০১১-পরবর্তী পর্যায়ে সেটুকুও রইল না। ফলে, তৃণমূল করার কারণ খুঁজতে গেলে একটিই সম্ভাব্য উত্তর— খাজনা আদায় করার অধিকার অর্জন করা। আজ যদি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই অধিকারটাই কেড়ে নিতে চান, তা হলে রাজ্যজুড়ে দলের কাঠামো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে না, সেই গ্যারান্টি দেওয়া মুশকিল। অতএব, যতই হল্লা হোক, প্রশ্রয় অব্যাহত থাকে।

রাজ্যের অনাচেকানাচে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন মাপের মনসবদার— তাদের মধ্যে কারও দখলে নদীর বালি, কারও সাম্রাজ্য নোনা জলের ভেড়িতে বিস্তৃত, কেউ রেশনের চালের চোরাকারবারি, কারও খাজনা আদায়ের ক্ষেত্র সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস, কেউ আবার হাসপাতালে রাজত্ব চালায়।

উত্তরটা সহজ, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। দুর্নীতির অধিকার এমন অনুভূমিক না হয়ে যদি উল্লম্ব হতো— মানে, যদি শীর্ষ স্তর থেকে ধাপে ধাপে দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ নীচের স্তরে পৌঁছত, আবার দুর্নীতি বাবদ উপার্জিত অর্থও প্রথমে শীর্ষ স্তরে পৌঁছতো এবং পরে তার হিস্সা নামত নীচের স্তরে, তা হলেও কিন্তু রাজনীতির দুর্নীতিভিত্তিক আকর্ষণ বজায় রাখা সম্ভব হতো। এক অর্থে সে কাঠামো অনেক বেশি কর্পোরেট এবং অনেক বেশি কুশলীও বটে। স্পষ্ট জানা থাকত যে, কোথায় কতখানি কাঞ্চনমূল্যে কতটা কাজ হবে। শিল্পমহলও এমন দুর্নীতিতে খুব আপত্তি করে না। তা সত্ত্বেও এমন অনুভূমিক গণতান্ত্রিক দুর্নীতির ব্যবস্থাটিই পশ্চিমবঙ্গে চালু রইল কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর দুর্নীতির রকমসকমে নেই, বরং শাসক দলের রাজনৈতিক চরিত্রে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস যে এককেন্দ্রিক দল, তা দলের জন্মলগ্ন থেকেই স্পষ্ট। ইদানীং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতার দ্বিতীয় মেরু হিসেবে উঠে এসেছেন বটে, কিন্তু তাতে দলের মূলগত চরিত্রটি পালটায়নি। তৃণমূল কংগ্রেসে ধাপে ধাপে ক্ষমতার বিন্যাস নেই— শীর্ষ নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে অনেক মাপের নেতা আছেন বটে, কিন্তু কোনো স্তরেই তাঁরা কোনো যৌথ ধাপ গঠন করেন না। শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে মেজো-সেজো-ছোটো-চুনো নেতার মধ্যে রয়েছে আনুগত্যের এক-একটি সূত্র— প্রতিটি আনুগত্যের সূত্র একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। কংগ্রেসের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তৃণমূলের জিন-শৃঙ্খলায় বাহিত হয়েছিল একটি পুরনো ব্যাধি--- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দলের অভ্যন্তরে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা। দিদি, সে ব্যাধি নিরাময়ের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছেন বললে অন্যায় হবে। ভালোই করেছেন! এমনটা চললেই বাকি দলের থেকে আপনার আলাদা থাকাটা সহজ হবে। □

অতিথি কলম

চেতন ভগত

প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতকেও শক্ত হাতে লাগাম ধরতে হবে

সরকারি খরচ কমানোর জন্য প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। সারাজীবন ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে যাঁরা অবিচল, ডোজ-ইন্ডিয়ার নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তাঁরাই আদর্শ ব্যক্তি।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পরে, নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দ্বারা ঘোষিত হয়েছে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাডভাইসরি কমিশন গঠনের প্রস্তাব। ট্রাম্প-প্রস্তাবিত এই কমিশনের নাম হতে চলেছে 'ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' বা ডিওজিই (সংক্ষেপে 'ডোজ')। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প জয়লাভ করার পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশাসনিক বিভাগ তৈরির প্রস্তাব বর্তমানে বিশ্বজুড়ে একটি আলোচনার বিষয়। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা এই দপ্তরটি আগামীদিনে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ইলন মাস্ক এবং একদা রিপাবলিকান পার্টির রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বিবেক রামস্বামীর নেতৃত্বে পরিচালিত হতে চলেছে। তাঁদের নেতৃত্বাধীন 'ডোজ' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি সরকারি বিভাগ নয়। এটি হতে চলেছে একটি উপদেষ্টা সংস্থা যাদের সঙ্গে নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতির সরাসরি যোগাযোগ থাকবে। এই সংস্থাটি বিভিন্ন উপায়ের সুলুকসন্ধান দেবে যা আমেরিকার ফেডারেল গভর্নমেন্ট (অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দ্বারা পরিচালিত মার্কিন প্রশাসন)-এর খরচ কমাতে এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়ক হবে।

ইলন মাস্ক ও বিবেক রামস্বামী দু'জনেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরেই সরব। ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রশাসনের অস্তিত্বের বিষয়টি ইতিমধ্যেই তাদের দ্বারা বার বার উত্থাপিত হয়েছে। ভারতেও ইদানীং শোনা যায় 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্ন্যান্স' (অর্থাৎ, ন্যূনতম প্রশাসন—উন্নত শাসন)-এর মতো স্লোগান। ইলন মাস্ক ও বিবেক রামস্বামীর চিন্তাপ্রসূত 'ডোজ'-এ হয়তো মূল্যবান অনেক কিছু রয়েছে, যার থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতীয়রা নিজস্ব সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হতে পারে। হয়তো ভারতেরও প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠান— 'ডোজ-ইন্ডিয়া'।

সব সরকারের ক্ষেত্রেই 'সরকারি ব্যয়' আবশ্যক। সরকারি কর্মচারীদের বেতন দান, অফিস পরিচালনা, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভরতুকি প্রদান, পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুলিশ ও শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঠিক এই কারণেই বিভিন্ন খাতে সব ধরনের সরকারি ব্যয়কে 'অপব্যয়' আখ্যা দেওয়াও রীতিমতো হাস্যকর। এছাড়া সরকারি ব্যয় বিষয়টি আপেক্ষিক। সরকারি ব্যয়বরাদ্দ সর্বদা একটি দেশের অর্থনীতির আকৃতি-প্রকৃতির সাপেক্ষে নির্ধারিত হওয়া উচিত। দেশীয় অর্থনীতির আকারের সাপেক্ষে সরকারি ব্যয় হওয়া উচিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, ক্ষুদ্রতর বা ন্যূনতম সরকার শব্দবন্ধটি হলো একটি আপেক্ষিক বিষয়। প্রশাসনকে অধিকতর কর্মদক্ষ করে তুলতে নাগরিক সমাজ তাদের প্রয়াস জারি রাখতে পারে। সরকারি তহবিল বড়ো মাপের। একটি বৃহৎ আর্থিক ব্যবস্থা থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকার যেহেতু বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেন-দেনের সঙ্গে যুক্ত, সেহেতু মাত্র কয়েক শতাংশ সরকারি ব্যয়ও যদি কোনো ভাবে বাঁচানো যায়, তবে সেই ব্যয় সংকোচ একটি বড়ো অঙ্কের সঞ্চয়ে পরিণত হয়।

'ডোজ'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন ইলন মাস্ক ও বিবেক রামস্বামী। 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' পত্রিকায় তাঁদের লেখা একটি খোলা চিঠিতে 'ডোজ'-সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের লেখা সেই খোলা চিঠি হতে সংগৃহীত উদ্ধৃতিটি দেওয়া হলো:

'আমাদের দেশ ও জাতি এই মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে আমরা যাঁদের নির্বাচন করবো, সরকার তাঁরাই চালাবেন। আজকের আমেরিকা সেইভাবে আর পরিচালিত হয় না। অধিকাংশ আইন-কানুন সম্ভূত নির্দেশাবলী মার্কিন কংগ্রেস প্রণীত কোনো আইন নয়। সেগুলি হলো নির্বাচিত নন এমন আমলাদের তরফে জারি করা কিছু নিয়ম ও বিধান (রুলস্ অ্যান্ড রেগুলেশনস্)। প্রতি বছর আমেরিকায় জারি হওয়া এইসব নির্দেশের সংখ্যা হাজার হাজার। আর্থিক বিষয়ে আইন সমূহ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (গভর্নমেন্ট এনফোর্সমেন্ট ডিসিশনস্) এবং বিশেষ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে বিভিন্ন ব্যয় (ডিসক্রিশনারি এক্সপেন্ডিচার্স)---অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দ্বারা হয় না। এমনকী রাষ্ট্রপতির দ্বারা

নানা পদ ও দায়িত্বে নিযুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অবস্থানও এই ধরনের ব্যয় এবং সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ারের বৃত্তের বাইরে। সরকারি সংস্থাগুলির বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন অসংখ্য আধিকারিক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত না হলেও বা নির্বাচিতদের দ্বারা মনোনীত না হয়েও এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। সরকারি চাকরি করার দৌলতে তাদের সবার চাকরি অতীব সুরক্ষিত। এই কারণে চাকরি যাওয়ার বিষয়টিতেও তারা বাস্তবিকই ভয়ডরহীন।'

উপরোক্ত বিষয়টি কি ভারতের ব্যাপারেও প্রযোজ্য নয়? ভারতের ক্ষেত্রেও এটি একটি চরম সত্য। এটা ঠিক যে সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে কেন্দ্রীয় বাজেট চূড়ান্ত হয়ে থাকে। সেই স্তরে বাজেট স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত হলেও বাজেটে প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প-সহ নানা প্রশাসনিক পরিকল্পনা উচ্চপদস্থ আমলাদের দ্বারাই হয়ে থাকে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যয়ের বিষয়টিও পুরোপুরি তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে। বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের বিষয়টির পর্যালোচনা কি সম্ভব নয়? সরকারি প্রকল্প বাবদ যাবতীয় সরকারি ব্যয় আতশকাচের নীচে কি আসা উচিত? যদি সেই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে সরকারি ব্যয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু হয়, তবে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তা হয়তো অনেকাংশে সহায়ক হতে পারে।

ভারত সরকারের বাজেটে সর্বমোট ব্যয়বরাদ্দ ৫০ লক্ষ কোটি টাকার সামান্য কিছু কম (বোঝার সুবিধার জন্য অর্থের অঙ্ক সরলীকৃত)। মোট সরকারি ব্যয়বরাদ্দের পাঁচ শতাংশ অর্থও যদি কোনোভাবে সাশ্রয় সম্ভব হয়, তবে তার পরিমাণ হবে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টাকার এই অঙ্কটি এক বছরে কাস্টমস্ ডিপার্টমেন্ট বা ভারতীয় শুল্ক বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত কাস্টমস্ ডিউটি (অর্থাৎ শুল্ক), অথবা মোট জিএসটি বা মোট আয়কর বা কর্পোরেট কর সংগ্রহের এক-চতুর্থাংশের প্রায় সমান। সঞ্চিত অর্থরাশি ব্যবহার করে পরিচালিত হতে পারে একাধিক প্রয়োজনীয় প্রকল্প। এর ফলে দেশের আর্থিক পরিস্থিতিও উন্নততর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থের জোগান অর্থনীতির পক্ষে বয়ে আনে শুভ সংকেত। আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির দরুন কমে মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হারও হয় কম। কম সুদের হার বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি-সহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। নানা সঞ্চয় প্রকল্পে সরকারের কাছে গচ্ছিত আমানতে সরকারি তরফে আমানতকারীদের দেওয়া হয়ে থাকে সরকারি সুদ। মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম দেওয়া সম্ভবপর হলে সরকারের তরফে এই সুদ কমানোর সুযোগ থাকে। সেই কম সরকারি সুদের হারের সাপেক্ষে সরকারি সুদ-বাবদ প্রদেয় অর্থরাশির পরিমাণ কম হলে পক্ষান্তরে তা সরকারি ব্যয় সংকোচে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই বলাবাহুল্য, কম সরকারি সুদের হারও সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী।

ভারতে এই তত্ত্বের প্রয়োগ কি সম্ভব? 'ডোজ-ইন্ডিয়া'র সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঠিক কী কী প্রয়োজন? ইলন মাস্ক ও বিবেক রামস্বামী শেষ পর্যন্ত কতদূর সফল হবেন তা অবশ্যই একটি দেখার বিষয়। সরকার আমলা-নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারলে লালফিতের ফাঁস অনায়াসে আলগা হতে থাকবে। এই কারণে প্রশাসনিক বৃত্তের বাইরের লোকজনের মাধ্যমে 'ডোজ' পরিচালনার বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই পদ্ধতি অনুসৃত হলে 'ডোজ-ইন্ডিয়া' থাকবে 'বহিরাগতদের' নেতৃত্বাধীন। রাজনীতিবিদ ও আমলাতান্ত্রিক ইকোসিস্টেম হতে জন্ম নেবে না 'ডোজ-ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব। অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও বিচারপতিদের ইকোসিস্টেম হতে তো কোনোভাবেই নয়। এই লেখার অবতারণা তাঁদের সমালোচনা উদ্দেশ্যে নয়, কারণ সরকারি খরচ কমানোর জন্য প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। সারাজীবন ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে যাঁরা অবিচল, ডোজ-ইন্ডিয়ার নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তাঁরাই আদর্শ ব্যক্তি। শিল্পপতি, বিশেষত উদ্যোগপতিরা এই কাজে উপযুক্ত। কারণ তাঁরা জানেন যে খরচ নিয়ন্ত্রণই হলো আর্থিক লাভের চাবিকাঠি। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একাধিক ভারতীয় সম্প্রদায় রয়েছে যাঁরা ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পারদর্শী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বানিয়া (পরম্পরাগতভাবে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকুল। সেই সূত্রে অর্থের মূল্য ও ব্যবহার তাঁরা ভালোই জানেন ও বোঝেন), জৈন, গুজরাটি, মাড়োয়ারিরা। ব্যবসায়িক জ্ঞানের অধিকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও এই বিষয়ে যথেষ্ট বোধসম্পন্ন। শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা শিল্পক্ষেত্রে অগ্রণীদের হাতে এই ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা প্রয়োজন। এই কাজে শিল্প-বিশেষজ্ঞদের যোগদান সত্যিই মূল্যবান। খরচ সাশ্রয়ের উপায়গুলি চিহ্নিতকরণে সরকারি তরফে তাঁদের সংস্থার ক্ষমতায়নও আবশ্যক। এটি সম্ভবপর হলে সরকার ও সমগ্র জাতির পক্ষে এই সংস্থাটি একটি অতি বড়ো সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে প্রশাসনের শীর্ষস্তরের সরাসরি সংযোগও বাঞ্ছনীয়।

ইলন মাস্ক ও ডোনাল্ড ট্রাম্প খুবই ঘনিষ্ঠ। ইলন মাস্কের পরামর্শ সরাসরি মার্কিন রাষ্ট্রপতির কানে পৌঁছাবে। ভারতেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার আশু প্রয়োজন। ভারতে যাঁরা এই সংস্থার দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের দেওয়া পরামর্শও প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কর্ণকুহরে প্রবেশ অতি আবশ্যক।

সংস্থাটি স্থাপিত হলে তাদের তরফে আসতে পারে অসংখ্য বাস্তবায়নযোগ্য, সঠিক পরামর্শ। সেই প্রসঙ্গটি অন্য কোনো নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতে পারে। বহু জনকল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্প এখনও ২০১১ সালের জনগণনার পুরনো তথ্য অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে চলেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর অনেকেই হয়তো মত দেবেন। প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলে নানা তথ্য-পরিসংখ্যান হয়ে উঠবে নিখুঁত। নির্ভুল পরিসংখ্যান-আধারিত হওয়ার ফলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি হয়ে উঠবে আরও বেশি কার্যকরী। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কোথাও কাজের চাপ, কোথাও বা সেরকম কাজ নেই। সেক্ষেত্রে কর্মীদের বদলি বা স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প বলবৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের মতামত জানাতে পারে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত এই উপদেষ্টা সংস্থা। ভারত-সব বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকারের আজ একটি করে 'ডোজ' প্রয়োজন। অর্থ বাজেট হলো সরকারের আগামীদিনের আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা। আসন্ন বাজেটে আসতে চলেছে একটি চমৎকার সুযোগ। সরকারি দক্ষতা এবং সরকারি প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত কীভাবে 'ডোজ'-এর মতো একটি ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে পারে, সেই বিষয়ে আগামীদিনের বাজেট কোনো দিশা দেখাতে পারে কিনা— তার দিকে হয়তো নজর থাকবে অনেকেরই। মনে রাখতে হবে যে একটি পয়সা সঞ্চয়ের অর্থ একটি পয়সা অর্জন। আর এই ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় প্রয়োজন বা সমপরিমাণ অর্থ উপার্জন।

(লেখক একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও স্তম্ভলেখক)

মগজেও চাই পুষ্টিকর ভাবনাচিন্তা

অজয় ভট্টাচার্য

শরীরের সুস্থতার জন্যে যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্যে মস্তিষ্ক সঞ্চালনকারী ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন। উপযুক্ত রসদ পেলে মস্তিষ্ক সতেজ থাকে। সর্বক্ষণ সস্তা চটুল বিষয় নিয়ে মজে থাকার ফলে মানুষের ভাবনাচিন্তার জগৎ ক্রমশ দূষিত হয়ে পড়ছে। আর এই সস্তা গাম্ভীর্যহীন মনোহর বিষয়গুলোর প্রধান উৎস সমাজমাধ্যম ও অন্তর্জাল মাধ্যম। অন্তর্জাল মাধ্যমের সস্তা, মাথামুণ্ডুহীন, নির্বুদ্ধিতায় ভরা বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে মস্তিষ্ক তার স্বাভাবিক কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলছে। যার ভয়ংকর পরিণতি 'ব্রেন রট' বা মস্তিষ্কের পচন। স্বাভাবিকভাবেই ২০২৪ সালের 'অক্সফোর্ড ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার' হিসেবে 'ব্রেন রট' শব্দটি নির্বাচিত হয়েছে। ১৮৫৪ সালে হেনরি ডেভিড থরো প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বরং বলা যায়, শব্দটি আজ আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

একসময় টেলিভিশনকে বলা হতো 'বোকা বাক্স'। অগভীর রসাত্মক রংচঙে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোকা বানিয়ে বসিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে টেলিভিশন। আর এভাবেই চ্যানেলগুলো নিজেদের প্রোপাগান্ডা গিলতে বাধ্য করে দর্শককে। এখন টেলিভিশনের জায়গা ভয়ংকরভাবে দখলে নিয়েছে স্মার্টফোন। তাই টেলিভিশনের দাপট কিছুটা কমেছে। কিন্তু তাতে লাভের লাভ কিছু হয়নি। টিভি চ্যানেলগুলো তাও কিছুটা রেখে ঢেকে চলত। কিন্তু স্মার্টফোন লাগামহীনভাবে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে জনজীবনের সর্বত্র। সত্যজিৎ রায় 'হীরক রাজার দেশ' ছবিতে রূপক অর্থে মগজ ধোলাই যন্ত্রের কারসাজি দেখিয়েছিলেন। সেই অর্থে টিভি,

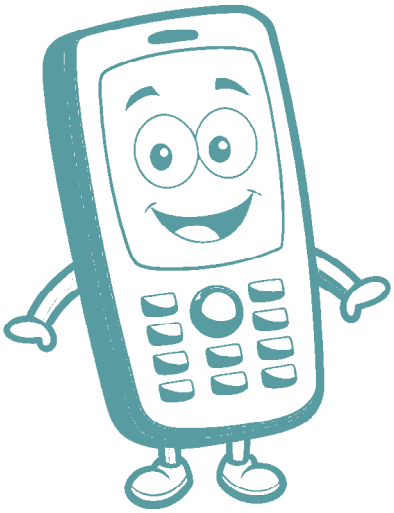

স্মার্টফোন জাতীয় যন্ত্রগুলিকে আধুনিক মগজধোলাই যন্ত্র বললে ভুল বলা হয় না। স্মার্টফোনের ঝা চকচকে স্ক্রিনের প্রলোভন থেকে রেহাই নেই কারও। উড়ো খবর, রসালো রিলস, আদি রসাত্মক ভিডিয়োর মাধ্যমে মানুষের মগজে বিষ ঢেলে চলেছে অহরহ। তাই কোনো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে ভুলে যাচ্ছে মানুষ। অথচ সচেতন ভাবনার মধ্য দিয়েই যে মগজে পুষ্টি জোগানো সম্ভব, সেকথা কেউ আর ভাবছে না। চারপাশে সচেতন ভাবনার উৎস যে নেই তা নয়। তবে মানুষ সচেতন ভাবনার উৎসগুলো সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলছে। সরকারি লাইব্রেরিগুলিতে এখন আর আগের মতো পাঠক নেই। সমাজমাধ্যমে ডুবে গিয়ে মানুষ বই পড়ার অভ্যাস শিকেই তুলে দিয়েছে। যার ফলে মানুষ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সৃজনশীল ভাবনার উৎসগুলোকে হারিয়ে ফেলছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'লোটাকম্বল' উপন্যাসের হরিশঙ্কর অফিস থেকে ফিরে অঙ্ক অনুশীলন করতেন। মস্তিষ্ক সতেজ রাখার জন্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের মূর্ছনায় ডুবে যেতেন। এখনকার সমাজে হরিশঙ্করদের গিলে নিচ্ছে স্মার্টফোন।

দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল মাধ্যমের প্রবল উপস্থিতির কারণে একদিকে যেমন 'গুছিয়ে লেখা', 'গুছিয়ে ভাব প্রকাশ করা'-র অক্ষমতা ফুটে উঠছে, অন্যদিকে সমস্যা সমাধানের প্রতি পরিশ্রম বিমুখতা দেখা দিচ্ছে। সমস্যা সমাধানের বারবার প্রচেষ্টা, অভিঘাত সৃষ্টি করে মনের অবচেতন স্তরে। শেষমেশ সমাধানের মূর্তরূপ ছবির মতো ফুটে ওঠে মানসপটে। ভাবনাচিন্তা করে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিমেষে সমাধানের প্রলোভন— মহাকর্ষ তরঙ্গের শনাক্তকরণে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা যুক্তির জালে গড়ে তুলেছিলেন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামের সাহায্যে মহাকর্ষ তরঙ্গ থেকে উদ্ভূত সংকেতকে কাজে লাগিয়ে মহাকর্ষ তরঙ্গের ছবি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল আইনস্টাইন যেমনটি কল্পনা করেছিলেন— বাস্তবে ঠিক তেমনিই। সুতরাং সৃষ্টিশীল হতে হলে কল্পনাপ্রবণ মনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। আর এই সবকিছুর জন্যে মস্তিষ্ক সঞ্চালন জরুরি। তার জন্যে মগজে পুষ্টি জোগানো একান্ত প্রয়োজন।

সব হারিয়ে চৈতন্যোদয় হলো হাসিনার

মমতা ব্যানার্জি কি শিক্ষা নেবেন ?

সাধন কুমার পাল

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। তাঁকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে। একটু সুস্থ বোধ করায় তিনি কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী মনে হয়, আমি কে?' উত্তরে ভক্তপ্রবর বলেন, ব্যাস, বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি,আমি আর কী বলব।' একথা শুনে ঠাকুরের ভাবসমাধি হলো। বাকি ভক্তরা ছুটে এলেন, ঠাকুর সকলকে স্পর্শ করছেন আর বলছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

গিরীশ ঘোষের সত্যি সত্যি চৈতন্য হয়েছিল। ঠাকুরের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথের চৈতন্য হয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আবার স্বামীজীর ভাবশিষ্য হয়ে সুভাষচন্দ্র চৈতন্য লাভ করেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন নেতাজী। ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা লাভ এই ধারাবাহিক চৈতন্য লাভেরই ফল।

লঙ্কেশ্বর রাবণের চৈতন্য লাভ হয়েছিল। তবে তা মৃত্যুর আগের মুহূর্তে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়। চৈতন্য প্রাপ্তির পর রামানুজ লক্ষ্মণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তৃতীয়টি ছিল, 'সঠিক সময়ে নিজের বন্ধু ও শত্রুকে চিনে নেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা শত্রুকে বন্ধু ভেবে ভুল করি আর বন্ধুকে শত্রু মনে করি। পরে দেখা যায় যাকে বন্ধু ভেবেছিলাম, সে আমাদের বড়ো ক্ষতি করেছে আর যাকে শত্রু ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম, সেই আমাদের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছে।' অন্তিম সময়ে চৈতন্য লাভ হয়ে রাবণের কিছু লাভ হয়নি, তার আগেই তার সোনার লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রাবণ লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, 'যদি কোনো শুভ ও ভালো কাজ করবে বলে মনস্থির কর, তাবে তা করতে বিলম্ব করবে না। কারণ জীবনে সব থেকে সময় হলো গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কেউ জানি না আমাদের জীবনে শেষ সময় কখন চলে আসবে, অনেক সময় অলসতায় আমরা করণীয় কাজ পিছিয়ে দিই, তারফলে বহু কাজ আমরা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারি না।'

পূর্ববঙ্গের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন প্রাক-স্বাধীনতাকালের রাজনীতিবিদ তথা ব্রিটিশ উদ্ভাবিত দলিত সমাজের নেতা। দেশভাগের সময় তিনি পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করে পাকিস্তানে যোগ দেন। তাঁকে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর যখন চৈতন্য লাভ হয়েছিল তখন সবই শেষ। তাঁর সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান পেয়ে গিয়ে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলতে বিলম্ব হয়নি জিন্নার। যোগেন মণ্ডলের শেষ সময়ে চৈতন্যোদয় হয়ে কোনো লাভ হয়নি। কারণ ততক্ষণে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর সর্বনাশ হয়ে গেছে।

বর্তমানকালে অধীররঞ্জন চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের অন্যতম। তাঁর নাকি চৈতন্যোদয় ঘটেছে। সারাজীবন মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন দিয়ে নিজের রাজনীতির আখের গুছিয়েছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা তাঁকে ব্যবহার করে নিজেরা শক্তিশালী হয়েছে, জনসংখ্যা বাড়িয়ে সত্তর শতাংশের উপরে নিয়ে গেছে, এখন মুসলমান ছাড়া আর কারও পক্ষে মুর্শিদাবাদে জেতা সম্ভব নয়, তখনই চৈত্যনোদয় হলো অধীরবাবুর। জীবনের অন্তিমলগ্নে এই সত্যটি উপলব্ধি করলেন তিনি। কিন্তু এতদিনে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গিয়েছে।

> **"পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন মুসলমান মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের সাম্প্রতিক বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, তারা এবার রাখডাক ছেড়ে ইসলামি আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অর্থাৎ বাংলাদেশি মোল্লাবাদীদের কলকাতা দখলের হুমকি এবং মমতা মন্ত্রীসভার মুসলমান মন্ত্রীদের বক্তব্য কোনোটাই কাকতালীয় ঘটনা নয়।"**

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ' মৌলবাদ ঠুনকো রাজনীতির বিষয় নয়। এটি অনেকটা ক্যানসারের মতো। এখনই ব্যবস্থা না নিলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। গোটা দেশ বিপদের মুখে পড়বে। তিনি আরও বলেন, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুরের বেশ কিছু এলাকা তাদের অংশ বলে দাবি করতে পারে বাংলাদেশ। সীমান্ত এলাকায় এখনই ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

অধীরবাবু মনে করিয়ে দেন, স্বাধীনতার সময় মুর্শিদাবাদ দুইদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানরা

ফঃ ২

মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেছিল। আজও মুসলমানরা মুর্শিদাবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অঞ্চলে তারা প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

অনেকে বলছেন, অধীরবাবুর মতো মমতা ব্যানার্জির চৈতন্যোদয় কবে হবে? বাংলাদেশের শেখ হাসিনার চৈতন্য ফিরেছে বিতাড়িত হবার পর। তিনিও একসময় মোল্লাবাদীদের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতার অট্টালিকা গড়ে তুলেছিলেন। দেশছাড়া লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেননি। হিন্দু নির্যাতনের অজস্র ঘটনা ঘটলেও কোনো ব্যবস্থা নেননি। তাঁর প্রশ্রয়ে মোল্লাবাদীরা শক্তি সঞ্চয় করেছে আর সময়মতো তাঁকেই বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করেছে। এরকম পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গেও তৈরি হয়েছে। কট্টরবাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের শক্তিশালী হবার সুযোগ করে দিয়ে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় টিকে রয়েছেন। যোগেন মণ্ডল কিংবা শেখ হাসিনার মতো বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চৈতন্য ফিরবে বলে মনে হয় না।

১৯৪৭ সালে একশ্রেণীর মানুষ দেশভাগের কথা শুনে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিলেন। আজও অরাজকতার বাংলাদেশে দিকে দিকে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চলছে। প্রতিদিন সেদেশে চড়া হচ্ছে ভারত বিরোধিতার সুর। তাদের প্রাক্তন সেনা আধিকারিকরা চারদিনে কলকাতা দখলের ডাক দিয়েছিলেন। তাদেরও টেক্কা দিয়েছে জেহাদি হুজুর মুফতি কাজি ইব্রাহিম। এই কলকাতা বা দিল্লি দখলের ডাককে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে একশ্রেণীর ভারতীয় মিডিয়া। এই মিডিয়ার বন্ধুরা কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিলে বুঝতে পারতেন যে কলকাতা দখল করতে আর তাদের বেশি বাকি নেই। কলকাতার জেহাদি আর ঢাকার জেহাদিরা একই সুতোয় বাঁধা। সেজন্য এদের হুমকি ফাঁকা আওয়াজ বলে মনে করলে ভুল হবে। কথা হলো, শত্রু সবল হোক বা দুর্বল, তাকে হালকাভাবে নেওয়া কি উচিত? বিশেষ করে শত্রুর গলায় যখন জেহাদের ডাক রয়েছে। সেজন্য তা হালকাভাবে না নিয়ে তারা কোন সাহসের ওপর ভর করে, কোন শক্তির ভরসায় কলকাতা বা দিল্লি দখলের ডাক দিয়েছে, সেটা বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরি।

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, বাংলাদেশ মোল্লাবাদীদের দখলে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের মোল্লাবাদী মুসলমানদের শরীরী ভাষা ও বোলচালের পরিবর্তন হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, তহা সিদ্দিকির মতো সেকুলার রাজনীতির মোল্লাবাদী নেতারা টিভি ক্যামেরার সামনে বুক ফুলিয়ে নিজেদের অ্যাজেন্ডা সামনে আনছে। তাসত্ত্বেও এদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণের জন্য এগিয়ে আসছে জাকাত ফান্ড এবং মমতা ব্যানার্জির উচ্ছিষ্টভোগী একশ্রেণীর মিডিয়া।

শুরু হয়েছে বিজয় দিবসের ন্যারেটিভ পালটানোর প্রয়াস। এবারের বিজয় দিবসে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য যুক্ত করে একটি মানচিত্র প্রকাশ করে 'নতুন ভূখণ্ড ও বন্দোবস্ত প্রয়োজন' বলে উল্লেখ ফেসবুকে পোস্ট করেন ড. ইউনুসের ডান হাত তথা সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তার সেই পোস্টে লেখা ছিল, 'বিজয় এসেছে তবে সামগ্রিক নয়। মুক্তি এখনো বহুত দূরে। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত জনপদ পুনরুদ্ধার ব্যতীত পোকায় খাওয়া পূর্ব পকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ নিয়ে আমরা মুক্তিকে ছুঁতে পারব না। এ রাষ্ট্রের জন্মদাগ তথা ভারত নির্ভরতা ও ভারতের আধিপত্য মুক্ত রাখতে ৭৫ আর ২৪-এর ঘটনা ঘটাতে হয়েছে। দুই ঘটনার ব্যবধান ৫০ বছর। কিন্তু আদতে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। নতুন ভূগোল ও বন্দোবস্ত লাগবে। একটি খণ্ডিত ভূমি একটা জন্মদাগ নেওয়া রাষ্ট্র দিয়ে হয় না।'

বাংলাদেশে যে মোল্লাবাদী জেহাদি শক্তি ক্ষমতা দখল করেছে তার অন্যতম প্রধান মুখ মাহফুজের সোশ্যাল মিডিয়ার এই পোস্ট থেকে স্পষ্ট যে, তাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে লক্ষ্যপূর্তির পর তাদের পরবর্তী লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। বাংলাদেশে হাসিনা প্রশাসনের মধ্যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে জেহাদিদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে যেভাবে হাসিনাকে বিতাড়িত করেছে, ঠিক একই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গেও প্রশাসন ও মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে ঘটানো হয়েছে জেহাদি শক্তির বিস্তার। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে এরাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্যে। বাংলাদেশে ক্ষমতা দখলের পর তারা এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে যে, তাদের মনে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দখলেও তারা সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন মুসলমান মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের সাম্প্রতিক বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, তারা এবার রাখঢাক ছেড়ে ইসলামি আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অর্থাৎ বাংলাদেশি মোল্লাবাদীদের কলকাতা দখলের হুমকি এবং মমতা মন্ত্রীসভার মুসলমান মন্ত্রীদের বক্তব্য কোনোটাই কাকতালীয় ঘটনা নয়। সবটাই নিখুঁত পরিকল্পনার অঙ্গ।

ফিরহাদ হাকিম, হুমায়ুন কবীর বা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীরা যা বলছেন তা তাদের নেত্রীর প্রশ্রয়েই বলছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতন নিয়ে, ওই দেশের জেহাদি তাণ্ডব নিয়ে, ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের জেলমুক্ত করা নিয়ে মমতা ব্যানার্জির কোনোরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে 'জয় বাংলা' স্লোগান নিষিদ্ধ হওয়ার মুখে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর মুখে এখন আর 'জয় বাংলা' স্লোগান যাচ্ছে না। ইউনুসকে খুশি করার জন্যই কি তিনি এই স্লোগান বন্ধ করলেন?

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে কিন্তু গভীর নিদ্রায় রাজ্য পুলিশ। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন 'আনসারুল্লা বাংলা'র দুই জঙ্গিকে অসম পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। এর পাশাপাশি অসম পুলিশ দেশের আরও কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে কেরালা থেকে গ্রেপ্তার এক জঙ্গির বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়ায়। ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার হয়েছ এক কাশ্মীরি জঙ্গি। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু হিন্দুরা দানখয়রাতি রাজনীতির মোহে আচ্ছন্ন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা— ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চৈতন্য জাগ্রত কর। না হলে এদের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী।

নোবেলজয়ী ড. ইউনুসের হাত ধরে বাংলাদেশ তালিবানি শাসনের দিকে ধাবমান

বাংলাদেশ আজ বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে, যাতে দগ্ধ হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। সারা পৃথিবীতে নিন্দিত, ধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও শান্তির নোবেলজয়ী ড. ইউনুস দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়ে ব্যর্থ।

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ড. মহম্মদ ইউনুসের হাতে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধদের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের জন্ম 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' এবং জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষময় ফল।

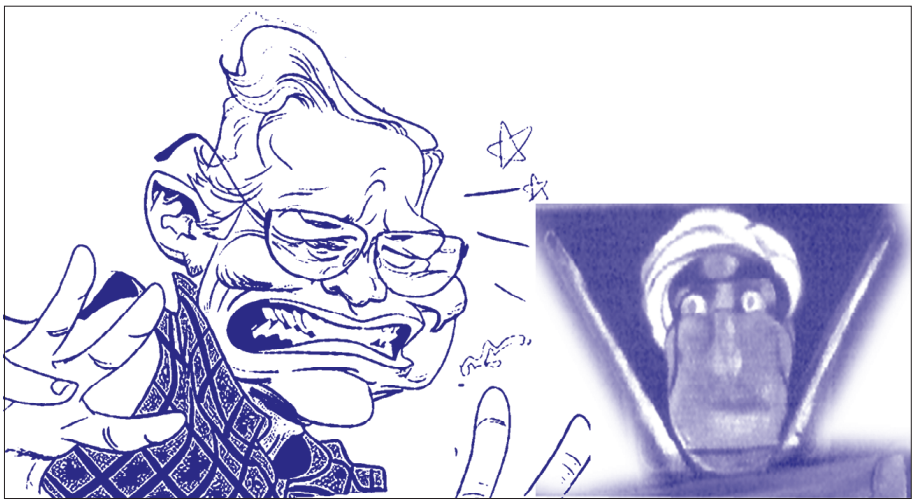

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ সালের ২৩ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির বোম্বে সম্মেলনে একদিকে জিন্না, অন্যদিকে নেহরুর কাটআউট টাঙিয়ে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গঙ্গাধর অধিকারী 'On Pakistan and National Unity' প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান' অনুসারে ভারত-পাকিস্তান অর্থাৎ খণ্ডিত ভারতের ধারণা প্রকাশ করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। এআইসিসি-র সেই অধিবেশন সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' পুস্তকের 'একটি স্বপ্নের সমাধি' অধ্যায়ে লেখেন, '১৪ জুন, ১৯৪৭ এআইসিসি-র অধিবেশন বসে। আমি এআইসিসি-র অধিবেশন দেখেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত অধিবেশন আমি কখনো দেখিনি। যে কংগ্রেস তার জন্ম লগ্ন থেকে ভারতভাগের বিরোধিতা করে এসেছে, সেই কংগ্রেস বসেছে ভারতভাগের প্রস্তাব পাশ করতে।' পরবর্তীকালে যখন ভারতভাগ অবশ্যম্ভাবী, বঙ্গ ও পঞ্জাব মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে জিন্না নিতে উদ্যত, ঠিক তখন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব পাশ করেন ২০ জুন ১৯৪৭। পশ্চিমবঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড। এইভাবে পঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত হয়ে মুসলমানপ্রধান পঞ্জাব যায় পশ্চিম পাকিস্তানে এবং হিন্দুপ্রধান পঞ্জাব থেকে যায় ভারতে।

পাকিস্তান ছিল জিন্না ও মুসলিম লিগের লেলিহান হিংসার ফসল। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক (Direct Action) কলকাতা, নোয়াখালি, লাহোরকে হিন্দুর রক্তে লাল করে তুলেছিল।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর শুরু হলো পাকিস্তানের দুই প্রান্তে হিন্দুহত্যা, সম্পত্তি লুঠ, নারীর সম্ভ্রমহানি, ধর্মান্তরণ— যা ছিল জিন্নার গুপ্ত অভিসন্ধি। দু'দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবে এই অঙ্গীকার করে ৮ এপ্রিল ১৯৫০ নেহরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু বাস্তবে তা রক্ষিত হয়নি। ফলস্বরূপ ১৯ এপ্রিল ১৯৫০ কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীর পদ থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করে সংসদে বলেন, 'আমরা ভুলে যাব না যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কেবলমাত্র মানবিক বিবেচনার ভিত্তিতেই ভারতের সুরক্ষার দাবিদার নন, বরং তাদের দুঃখ-কষ্ট ও তাদের বিনিময়মূল্য হিসেবেও তারা

কোনো সংকীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থের জন্য আত্মত্যাগ করেননি, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা ভারতের স্বাধীনতা ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবক যাঁরা দেশের জন্য হাসতে হাসতে স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের অন্তঃস্থলের দাবিই ছিল এদেশের হিন্দুদের বিশেষত সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের ন্যায় ও সুবিচার প্রাপ্তি।'

ইতিপূর্বে ২৯ জুলাই ২০০৯ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আহ্বানে ঢাকা সফর করেন। তারপরেই পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও জঙ্গিদের অবাধ করিডোর খুলে দেন।

১৯৫২ পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যেও উদ্বাস্তু স্রোত অব্যাহত থেকেছে। পাকসেনা ও রাজাকারদের মানবতাবিরোধী আগ্রাসনের পরও ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন হলো। দ্বিতীয় স্বাধীনতার পর 'আত্মবিস্মৃত' হিন্দু বাঙ্গালি ভেবেছিল এবার দীর্ঘদিনের সহাবস্থান বজায় রেখে স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান করতে পারবে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুরের হত্যার পর তা আবার হিংস্র আকার ধারণ করে। শেখ মুজিবুরের পর ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে ২০২৪ শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের সখ্যের কারণে হিন্দু নিপীড়ন বন্ধ না হলেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে ছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এবং ড. মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। যে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭১-৭২-এ বাংলাদেশের জন্য ২.৫ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক সাহায্য তুলে প্রতিদিন যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের ৩ লক্ষ মানুষকে ধর্মমত নির্বিশেষে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেখানে তাদের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে এবং আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। হিন্দু নারীরা চরমতম লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। চাকুরি থেকে বলপূর্বক ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। জমি দখল হচ্ছে, দোকান লুঠ ও ভাঙচুর হচ্ছে। ধর্মান্তরণ করা হচ্ছে। স্কুল-কলেজে হিন্দু-বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে না। এককথায় মাৎস্যন্যায় ব্যবস্থাকে ড. ইউনুস প্রশ্রয় দিচ্ছেন ও লালন পালন করছেন। চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অনুপম সেন-সহ তিনজন অধ্যাপককে বলপূর্বক পদত্যাগ করান হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকত তার 'কৃষি ভূমি জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' বইতে দেখিয়েছেন, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে পাঁচ দশকে ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং হিন্দুদের ২০ লক্ষ একর জমি হারাতে হয়েছে। *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

আমেরিকার পুতুল ও পাকিস্তানের দোসর রাজাকার, হেফাজত, জামাত এবং বিএনপি-র অঙ্গুলি হেলনে সংখ্যালঘু নির্মূলের এক

জনগণনাতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের হার (শতাংশে)				
জনগোষ্ঠী	১৯৫১	১৯৭৪	২০১১	২০২১
মুসলিম	৭৬.৯	৮৫.৪	৯০.৪	৯১.০৪
হিন্দু	২২.০	১৩.৫	৮.৫	৭.৯৫
বৌদ্ধ	০.৭	০.৬	০.৬	০.৬১
খ্রিস্টান	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩০
অন্যান্য	০.১	০.২	০.১	০.১২
সূত্র : বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো, আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২১				

বৃত্তের ষড়যন্ত্রের শামিল। যদিও দক্ষিণ সীমান্তে আরাকান আর্মির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের মোল্লাবাদীরা র‍্যাডিকাল ইসলামের নামে কখনো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য, কখনো কলকাতা, আবার কখনো দিল্লি দখলের স্বপ্নে বিভোর হচ্ছে। মোল্লাবাদীরা কেবল বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নেই, ড. ইউনুসের ছেড়ে দেওয়া অপরাধীরা সীমান্ত পার করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে নাশকতার পরিকল্পনা করছে। অতিসম্প্রতি কাশ্মীরের জঙ্গি জাভেদ মুন্সি ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার , কেরালা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে বাংলাদেশ আল কায়দার শাখা সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য সাদ রাদি, কখনো মুর্শিদাবাদ, হরিহরপাড়া, নওদা, হরিদেবপুর।

বাংলাদেশ আজ বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে, যাতে দগ্ধ হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। সারা পৃথিবীতে নিন্দিত, ধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও শান্তির নোবেলজয়ী ড. ইউনুস দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়ে ব্যর্থ। বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ সংবাদ সাপ্তাহিক 'দ্য ইকোনমিস্ট' ২০২৪-এ সেরা দেশ হিসেবে বেছে নিয়েছে বাংলাদেশকে। অর্থনৈতিক উন্নতি বা প্রগতির নিরিখে এই শিরোপা। হাসিনার ১৫ বছরে শাসনকালে এই সাফল্য এসেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের সময় বাংলাদেশে জেহাদি শক্তি মাথা তুলেছে এবং আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। বিএনপি-কে দুর্নীতিগ্রস্ত দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। হাসিনার এই শিরোপা ভারতের সহযোগিতায় এসেছে তা বাংলাদেশের মধ্যবয়সি ও প্রবীণ মানুষরা একবাক্যে স্বীকার করেন কিন্তু মাদ্রাসা, খারিজি মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নবপ্রজন্ম মোল্লাবাদের আঁতুড়ঘরে মৌতাত নিচ্ছে। 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ' ধানসিঁড়ির কবি জীবনানন্দের জন্মভিটায়। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা দেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দুঃখ, আবেগ কতটুকু?

অমিত কুমার চৌধুরী

কলকাতায় এক উদ্বাস্তু পরিবারের এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। তার জন্ম কলকাতাতে কিন্তু তার বাপ-ঠাকুরদা ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে দেশের দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন যে ভারতে মুসলমান ক্রিকেটারদের নিয়ে হিন্দুরা খুব বেশি খারাপ মন্তব্য করেন। মৃদু আপত্তি করে বললাম যে হয়তো কিছু করে কিন্তু মুসলমান ক্রিকেটারদের আমরা সম্মানও করি যথেষ্ট। পাকিস্তান, বাংলাদেশে হিন্দু ক্রিকেটাররা তো হিন্দু বলেই অসম্মানিত হন কিন্তু ভারতে বসবাসকারী বহু মুসলমানকে দেখা যায় পাকিস্তান বা বাংলাদেশ জিতলে তাঁরা খুশি হন, ভারত জিতলে দুঃখ পান। পাকিস্তানে হিন্দু ক্রিকেটার দানিস কানোরিয়ার প্রতি অপমানজনক ব্যবহার তো সে দেশের ক্রিকেটারই স্বীকার করেছেন।

ভদ্রলোক আমার কথা মানলেন না। তার কিছুদিন পরে বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলা নিয়ে মুসলমানদের ভারতের প্রতি অসভ্যতার কিছু নমুনা এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচারের কিছু তথ্য তাকে পাঠিয়ে লিখেছিলাম— দেখুন, আপনার ফেলে আসা দেশে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি কী অমানবিক ব্যবহার করছে। ভদ্রলোক ভীষণ আপত্তি করে বললেন, বাংলাদেশকে আপনি আমার ফেলে আসা দেশ বলছেন কেন? আমি তো কলকাতায় জন্মেছি, ভারত আমার দেশ, বাংলাদেশ আমার দেশ নয়। বিনম্রতার সঙ্গে তাকে বলি— নিশ্চয়, আপনি এদেশের নাগরিক, বাংলাদেশের নন। কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষের বাসস্থান তো পূর্ববঙ্গে ছিল। দেশ বিভাজন হয়েছিল বলেই তো এদেশে তাঁরা

এসেছিলেন, না হলে তো তাঁরা ওখানেই থাকতেন, আর আপনার জন্ম হয়তো ঢাকাতেই হতো। এতো শীঘ্র মাত্র ৭৫ বছরেই হারানো দেশকে ভুলে যান কী করে?

তাকে আবার বললাম— আচ্ছা, দেশ বলতে কী বুঝি আমরা? এক সময় আফগানিস্তান, পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ এই অঞ্চলগুলো ভারতেরই অঙ্গ ছিল। আমাদের দুর্বলতার কারণে আমরা সব হারিয়েছি। তা বলে আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া দেশ, পূর্বপুরুষের ইতিহাস সব ভুলে যাবো? স্বামীজী বলেছেন, 'ভবিষ্যৎকে গড়তে গেলে অতীতের দিকে মুখ ফেরাতেই হবে।' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বাঙ্গালি আত্মবিস্মৃত জাতি'। নীরদ চৌধুরী বলেছেন, 'বাঙ্গালি আত্মঘাতী জাতি'। তিনি আরও বলেছেন, 'বিগত একশো বছরে বাঙ্গালি কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।' হারিয়ে যাওয়া দেশ নিয়ে কি আমাদের কোনো দুঃখ, আবেগ থাকতে নেই?

বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর চলমান অমানবিক অত্যাচার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সেরকম কোনো হেলদোল নেই। ভাবখানা এইরকম যে ওটা তো ওই দেশের ব্যাপার, আমাদের করার কী আছে? পূর্ববঙ্গ থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন তাদের অধিকাংশের মনে পূর্ববঙ্গ নিয়ে সে রকম কোনো আবেগ দেখি না। তারা তাঁদের উত্তরপুরুষদের দেশ হারানোর দুঃখ বেদনার কথা সেভাবে বলেন না। আর এখনকার নতুন প্রজন্ম যারা এই দেশে জন্মেছে তারা মনে করতেই চায় না যে তাদের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে ছিলেন। ওপারে হিন্দুদের ওপর কোনো অত্যাচার হলে তার অভিঘাত এপারেই পড়বে সবার আগে। তাই আমাদের ওপারের ঘটনার প্রতি

সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে একজন হিন্দুর কথা এক বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে পড়েছিলাম। তিনি বাংলাদেশে সাহিত্য চর্চা করতেন, কবিতা লিখতেন। হঠাৎ একদিন মোল্লাবাদী মুসলমানদের রোষানলে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলেন।

এখানে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন যে ওপারে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারে এপারের হিন্দুদের নেই কোনো চিন্তা, নেই

প্রতিবাদ। এজন্যই দেশ হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের নিস্পৃহতা, নির্লিপ্ততা দেখে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আক্ষেপ করে 'ভিটেছাড়া' শীর্ষক এক কবিতা লিখেছিলেন। আমেরিকার এক কৃষ্ণাঙ্গ লেখক অ্যালেক্স হেলি তাঁর বিখ্যাত Roots নামক বইয়ে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, তা হলো হেলির মনে একদিন প্রশ্ন জাগলো আমি বা আমরা কারা? আমরা কি সত্যি এদেশের মানুষ? আমেরিকার সব মানুষই সাদা চামড়ার কিন্তু আমরা তো কালো চামড়ার! সেই প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তুলল। উত্তর খোঁজার চেষ্টায় মগ্ন হলেন। জানতে পারলেন, তারা আফ্রিকান নিগ্রো।

শুরু করলেন অনুসন্ধান। ছুটে গেলেন আফ্রিকা মহাদেশে। বহু বছর ধরে, লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করে আফ্রিকা মহাদেশের কোন দেশে, কোন রাজ্যে, কোন জেলায়, এমনকী কোন গ্রামে তাদের বাড়ি ছিল তা বের করে ফেললেন, এমনকী তার পূর্বপুরুষের নামও উদ্ধার করলেন। তার পূর্বপুরুষের নাম ছিল কুন্টা কিন্টে। কুন্টা কিন্টে একদিন কাঠ কাটার জন্য জঙ্গলে গিয়েছিলেন সেই সময় ইউরোপের তথাকথিত এক সভ্য মানুষ জোরপূর্বক তাকে ধরে নিয়ে জাহাজে তুলে আমেরিকায় নিয়ে আসে। সেই কুন্টা কিন্টেরই উত্তরপুরুষ আজকের বিখ্যাত লেখক অ্যালেক্স হেলি।

মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েল বলে একটি ছোট্ট দেশ আছে। জাতিতে তারা ইহুদি, ভাষা তাদের হিব্রু। বর্তমানে জনসংখ্যা মাত্র দেড় কোটি। তারা খুব মেধাবী ও ব্যবসায় খুবই দক্ষ। ওইটুকু জনগোষ্ঠীর বিশ্বে প্রায় ৩১৫টি নোবেল পাওয়া প্রমাণ করে তারা কত মেধাবী এবং বিশ্ব সভ্যতায় কত অবদান রেখেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মানবতাবাদী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে, দার্শনিক কার্ল মার্কস, এছাড়া অসংখ্য বিজ্ঞানী সকলেই ইহুদি। আর বিশ্বে যত বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মালিক প্রায়ই ইহুদি। অথচ তাঁরা প্রায় হাজার বছর আগে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রথমে রোমানরা, পরবর্তীতে পারসিকরা, তারপর মুসলমানেরা শেষে ব্রিটিশরা তাদের দেশ দখল করে নিয়েছিল। ইহুদিরা যে দেশে থাকতেন সেই দেশের সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়ে থাকতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ভাষা হিব্রু প্রায়ই ভুলেই গিয়েছিলেন। আমেরিকায় এক ইহুদি মৃত্যুশয্যায় বিড় বিড় করে কী যেন বলছেন। কাছে গিয়ে বোঝা গেল তিনি তার মাতৃভাষা হিব্রুতে কিছু বলছেন। নিজের ভাষার প্রতি তাদের কত আবেগ! আর আমাদের দেশে কেউ সংস্কৃত ভাষা বললে, অনেক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়, উপহাস করে বলা হয় ওটাতো মৃত ভাষা, ওটার চর্চা নিষ্প্রয়োজন। সেই ইহুদিরা পৃথিবীর যে দেশেই বসবাস করতেন, সেই দেশে বছরে একদিন সকলে মিলে বলতেন, হে আমার মাতৃভূমি জেরুলালেম, তোমাকে আমি কখনো ভুলবো না, যদি কোনোদিন তোমাকে ভুলে যাই, আমার ডান হাতটি যা দিয়ে আমি তোমাকে প্রণাম করি তা যেন অকেজো হয়ে যায়। অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের অভিশাপ দিতেন। এতো তীব্র ছিল তাদের দেশপ্রেম, মাতৃভূমি হারানোর যন্ত্রণা। রোমানরা তাদের মন্দির ধ্বংস করেছে, তাঁরা সে বেদনা ভুলে যাননি।

ইহুদি দম্পতিরা বিবাহের সময় তাদের মন্দির ধ্বংসের স্মরণে কাচের বোতল ভাঙতেন আর বলতেন যে, আগামী বছর জেরুজালেমে একত্রিত হবো। এভাবে বছরের বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কারও জীবনেই তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তবুও তারা তাদের মাতৃভূমি হারানোর বেদনা ভুলে যাননি, ভুলতে দেননি। মাতৃভূমি হারানোর যন্ত্রণা ধিকি ধিকি করে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, নিভতে দেননি, ভুলতে দেননি। তাই ১৯৪৮ সালে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে তাঁরা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া ভূমি ফিরে পেয়েছিলেন। এই ভূমিহীন ইহুদি জাতি তাঁদের নতুন দেশ ইজরায়েল গঠন করেছিলেন। অথচ আমরা হিন্দুরা পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা দেশ নিয়ে এই রকম ভাবতে পারি না। আমরা আমাদের ঢাকা, লাহোরকে ভুলে গিয়েছি। □

পশ্চিমবঙ্গ কি ইসলামি শাসনের পথে

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

আজকে পশ্চিমবঙ্গের নিরীহ হিন্দু নাগরিকরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? এ প্রশ্ন এখন উঠছে রাজ্যের কয়েকটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পর। প্রথমে বলি, এ রাজ্যে ওবিসি কোটাকে অপব্যবহার করে ধর্মের ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ চালু আছে। অথচ, ভারতের সংবিধানে তার কোনো স্বীকৃতি নেই। মুসলমানদের মধ্যে যে শ্রেণী বিভেদ আছে তা স্বাধীনতার সময় থেকেই এদেশে রয়ে যাওয়া দেওবন্দি নেতারা স্বীকার করতেন না। তাদের মধ্যে ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ যথেষ্ট ছিল।

সংবিধানের বাইরে গিয়ে এই সংরক্ষণ নীতিগত ও পদ্ধতিগতভাবে বেআইনি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমঝোতা ও ভোট কেনার প্রয়োজনে বামফ্রন্টের সময়ে এই নীতি চালু হয়। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেসের মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ বিষয়ে কোনো বাধা দেননি। অবশ্য কংগ্রেসের যে পরিবারের হাতে দেশের অর্ধশতাব্দীর বেশি শাসন ক্ষমতা ছিল, তার বর্তমান পারিবারিক নেত্রী তাঁর কর্মপদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন যে, ওই দলের কাছে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালাম, বর্তমানে কেরালার রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান এদের মতো জ্ঞানী, দেশপ্রেমী মুসলামানরা কাছের মানুষ নন। তাঁদের কাছের মানুষ হলো ভারতে শরিয়ত কায়েম করার জন্য লড়াই করা জাকির নায়েক আফজল গুরু, শর্জিল আহমেদরা।

যখন রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী বলেন যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে নিয়ে আসা তাদের পরম উদ্দেশ্য। এ তো এ রাজ্যকে দার-উল-ইসলামে পরিবর্তন করার ডাক!

এই কংগ্রেসের উত্তরাধিকার বহন করছে মমতা ব্যানার্জি। তিনি ক্ষমতা লিপ্সার কারণে পৃথক দল তৈরি করে এখন রাজ্যে ক্ষমতায় বসে আছেন। তৃণমূল তাদের পূর্বসূরি, সিপিএমের থেকে যে জেহাদি ভারত বিরোধী শক্তির স্তাবকতার নীতি গ্রহণ করেছিল, তাকেই সমস্ত রকম নীতি, নিয়ম বিসর্জন দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'সংখ্যালঘু' তোষণের নীতি নিয়ে সংবিধান বিরোধী কাজ করে চলেছে। এই কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএম এখন এক ইন্ডি-জোট গঠন করে এভাবেই দেশ ও জাতি বিরোধী নীতি নিয়ে রাজনীতি করছে।

একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুর কথা উল্লেখ থাকলেও কোথাও মুসলমানদের সংখ্যালঘু বলা হয়নি। ভারতের অঞ্চল বিশেষে কোথাও হিন্দু, কোথাও মুসলমান এবং একটি করে অঞ্চলে শিখ ও খ্রিস্টান পন্থাবলম্বীরা সংখ্যাগুরু। সারা ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে হিন্দুদের পরেই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু হলো মুসলমানরা। সুতরাং গোটা দেশে অথবা অঞ্চল বিশেষে মুসলমানরা কখনোই 'সংখ্যালঘু' তকমা পেতে পারে না। সংবিধানের কোথাও মুসলমানদের সংখ্যালঘুর তকমা দেওয়াও হয়নি।

শুধু রাজনৈতিক নেতাদের নোংরা স্বার্থসিদ্ধি ও জেহাদি, ভারত বিদ্বেষীদের সম্প্রদায়গত স্বার্থের কারণে এমনভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে দেশে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে অন্যদের বঞ্চিত করে দীর্ঘদিন ধরে ফয়দা লোটা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখা দলগুলি এভাবে 'সংখ্যালঘু' তত্ত্ব সাজিয়ে জেহাদি তোষণ করে চলেছে, তার অবিসংবাদী ফল হয়েছে রাজ্যের জনবিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের জনবিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসা, মসজিদের সংখ্যা প্রশ্নাতীতভাবে বেড়ে গেছে। কংগ্রেসের এক প্রাক্তন এমপির কথায় বোঝা যাচ্ছে, অন্তত মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হওয়ায় তারা যে কোনো সময় বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের দাবি

তুলতে পারে। রাষ্ট্রবিরোধী দলগুলির নিশ্চয় এ ব্যাপারে সমর্থন থাকার কথা!

স্বাধীনতার পর থেকেই এই ব্যাপারে এই রাজনৈতিক দলগুলি কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে, মুসলমানদের সমর্থন জুগিয়েছে। কিছুদিন আগে একই স্থানে কয়েকদিনের তফাতে সংগঠনের ডাকে দুটি জমায়েতের ডাক দেওয়া হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে ভূমিকা নেওয়া হয়েছিল, তাতে বোঝা গেছে যে এ রাজ্যে দুই প্রধান দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের প্রশাসন দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। প্রথম শ্রেণীর সুবিধা পাওয়া নাগরিকরা মুসলমান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা হলেন হিন্দু ও অন্যান্য।

গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ধর্মতলাতে রানি রাসমণি রোডে বঙ্গ বিবেক হিন্দু সুরক্ষা সমিতির ডাকে '৭১-এর 'বিজয় দিবস'-এর দিনে 'বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার, মন্দির ভাঙচুর, হিন্দুদের সম্পত্তি লুটপাট বন্ধ করার এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশে হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষায় দলে দলে যোগদান করুন' ---এই আবেদন জানিয়ে তারা যখন পুলিশ-প্রশাসনের কাছে অনুমতি চায় সে অনুমতি তারা পায় না। তারপর আদালতের নির্দেশে ওই সংগঠন সেখানে সভা করার অনুমতি পায়।

অথচ, একই জায়গায় ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামি দরগা ফুরফুরা দরবার শরিফ মোজাদ্দেদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশনের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে করে জনসভার আয়োজনের আবেদন করলে, তারা কিন্তু জামাই-আদরে সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি পায়। এখানে বলে রাখা দরকার, সংবিধানে এই ওয়াকফ সম্পত্তির কথা ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পেছনের দরজা দিয়ে কংগ্রেস দল গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সংশোধনী ঢোকায়। আজ পর্যন্ত সংবিধানে যত সংশোধন হয়েছে, তার সিংহভাগ করেছে কংগ্রেস। এমনকী জরুরি অবস্থা জারি করে, বিরোধী সাংসদদের জেলে ঢুকিয়ে, কংগ্রেস সংবিধানে দেশের নাম, পরিচয় পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। সেই বিশেষ পরিবর্তনের বিষয়টিই একজন কমিউনিস্ট অধ্যাপক ১৯৪৮ সালে আম্বেদকরজীকে জানিয়েছিলেন। আম্বেদকরজী কারণ -সহ তার বিরোধিতা করে অধ্যাপককে যথোচিত জবাব দেন।

এর থেকে একটা কথা পরিষ্কার, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের কাছে মুসলমান ও তাদের সংগঠন প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা পাচ্ছে। লিখিতভাবে না হলেও তাদের কার্যকলাপে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যান্য নাগরিক, বিশেষভাবে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মাত্র। আরেকটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার এক্স হ্যান্ডেল থেকে জানা যাচ্ছে, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুরে একটি ঘটনা ঘটেছে। সেখানে স্থানীয় শাসকদল একজন মহিলা নেত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধর, শ্লীলতাহানি ও লুঠপাট চালায় শাসকদলেরই জেহাদি লোকজন। পুলিশ এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। অর্থাৎ এ রাজ্যে শাসক ও বিরোধী যে দলের মানুষই হোন না কেন হিন্দুদের সঙ্গে এরকম এবং মুসলমানদের সঙ্গে অন্যরকম ব্যবস্থা রাজ্য প্রশাসনের অবস্থান বুঝিয়ে দিচ্ছে। আবার এ কথাও বলা যেতে পারে যে, রাজ্যের মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ মানুষ জেহাদিদের সঙ্গে জড়িত বা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। অথচ, এমন প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের ফলে অন্যরা জেহাদিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পান না।

এখানেই শেষ নয়। সন্দেশখালি ও মিনাখাঁর ঘটনায় বারবার প্রমাণ হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ। এখানে একটি বার্তা দেওয়া হয় যে, এই রাজ্য সরকার সর্বদা মুসলমানদের সঙ্গে আছে। এদের নীতির প্রশ্নেও এই দ্বিচারিতা এবং সংবিধান বহির্ভূত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই ২০১২ সালের শুরুতে মসজিদের ইমামদের ২৫০০ টাকা এবং যারা মসজিদের মোয়াজ্জেমদের ১৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে ভাতা দেওয়া শুরু হয়। হাইকোর্ট এভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের ভাতা দেওয়া অসাংবিধানিক বলে বাতিল করলেও রাজ্য সরকার ঘুর পথে তা চালিয়ে গেল। তারপরও তারা ইমামদের ভাতা বাড়িয়ে মাসে ৩০০০ টাকা করল। পরে হিন্দু ভোট হারানোর ভয়ে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কিছু মন্দিরের অল্প সংখ্যক পুরোহিতকে ১৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে ভাতা দিতে শুরু করে। পুরোহিতদের সংখ্যার তুলনায় বহুগুণ বেশি ইমাম ও মোয়াজ্জেমরা ভাতা পাচ্ছেন এবং তা পেতে সরকারি পরিচয় পত্রের প্রয়োজন নেই। সাংবিধানিক স্বীকৃতি ব্যাতিরেকে রাজ্য সরকার এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে নামিয়ে এনেছে।

বারবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী ছড়িয়ে বুঝিয়েছেন, রাজ্যের জেহাদিদের তিনি কত সম্মান করেন। এর ফলে, ধীরে ধীরে এ রাজ্যে যে জেহাদি কার্যকলাপ এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বেড়েছে, তাই নয়, শাসকদল তাদের পুনর্বাসন পর্যন্ত দিয়েছে। এটা প্রশাসনিক মদত ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে এ রাজ্য দেশ বিরোধী বিভিন্ন জঙ্গি মডিউলের সেফ হেভেন হয়েছে। বারবার এই রাজ্য থেকে যাওয়া অন্যান্য রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপে ধরা পড়া মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এ খবর জানা গেলেও এখনো পর্যন্ত এই কাজ হয়ে চলেছে।

প্রশাসনিক স্তরে এই কাজে যে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে, সেটা বোঝা যায়, যখন রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী বলেন যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে নিয়ে আসা তাদের পরম উদ্দেশ্য। এ তো এ রাজ্যকে দার-উল-ইসলামে পরিবর্তন করার ডাক! আবার রাজ্যের শাসক দলের একজন প্রভাবশালী এমএলএ বলেছেন জেলায় তারা ৭০ শতাংশ, হিন্দুরা ৩০ শতাংশ। হিন্দুদের দু'ঘণ্টায় ভাগীরথীর জলে তারা ভাসিয়ে দিতে পারে। এসব বলার পরেও তারা রাজ্য প্রশাসনে এবং দলীয় নেতৃত্বে বহাল তবিয়তে স্বস্থানে আছেন। এতেই বোঝা যায়, দলীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে এদের কথায় সমর্থন আছে।

তালিবানি শাসনের আরেকটি বড়ো প্রমাণ হলো, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ ও পাচারের ঘটনায় রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তরের গতানুগতিক নিস্পৃহতা। এসবই প্রমাণ করছে শাসকদলের মদতেই পশ্চিমবঙ্গ ইসলামি শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে। □

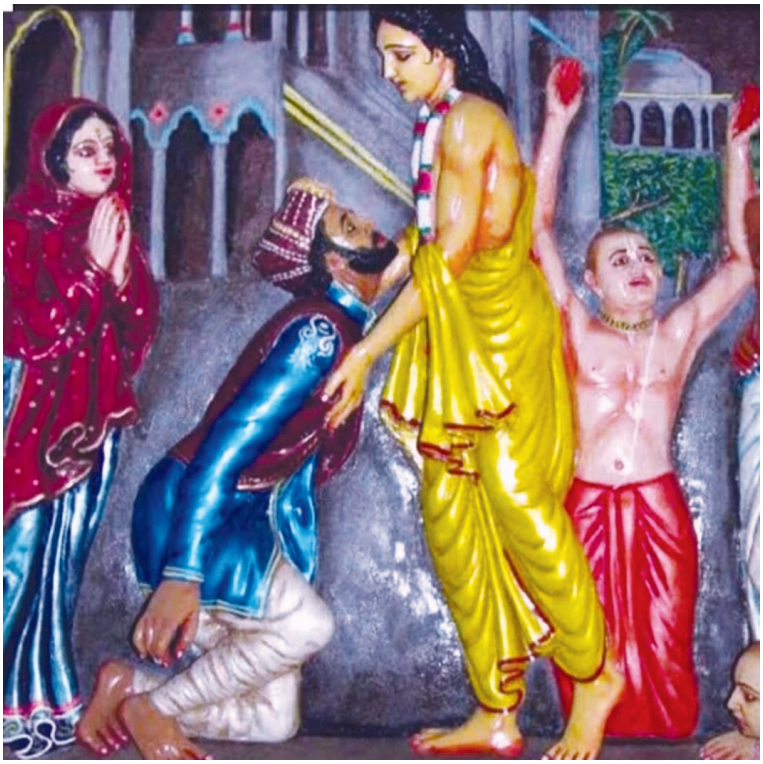

জাতির জাগরণে নবদ্বীপের সিংহপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

অর্ণব দাস

আমরা বাঙ্গালি। ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় অতিক্রম করতে করতে আজ আমরা এই সময়ে এসে পৌঁছেছি। কত ঘাত-প্রতিঘাত, অত্যাচার-অনাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন যুগে যুগে নেমে এসেছে আমাদের বঙ্গ জীবনের উপর তবুও আমরা অনড়, অটল, অটুট মানসিক শক্তি দিয়ে রক্ষা করে চলেছি আমাদের বাঙ্গালি সত্তা। বাঙ্গালি বড়ো ভাবুক জাতি, তাই ভাবের রাস্তা ধরে চলতে চলতে যখনই মুখ থুবড়ে পড়েছে তখনই বঙ্গমাতার অন্তর হতে আবির্ভূত হয়েছেন বাঙ্গালির ত্রাতাগণ, রক্ষা করেছেন শাশ্বত সনাতন জীবনধারাকে। যুগে যুগে বাঙ্গালি রক্ষা পেয়েছে বটে, তবে যুগের নিরিখে ভাগ করলে দেখতে পাওয়া যাবে আধুনিক যুগের বাঙ্গালি ইতিহাস-বিমুখ এক জাতিতে পরিণত হয়েছে, আর এর ফলস্বরূপ হারিয়ে গিয়েছে বাঙ্গালির প্রকৃত ইতিহাস অন্বেষণের মানসিকতা।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'পৌষপার্বণ' কবিতায় বঙ্গজীবনের কথা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন— 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'। সত্যই বঙ্গদেশের ইতিহাস বড়ো বৈচিত্র্যময়, তবে যুগের পর যুগ ধরে বাঙ্গালি 'রঙ্গে' মেতে 'ভঙ্গ'-এর ইতিহাস ভুলে গেল, বলা ভালো অতি সুকৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া হলো। তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা স্মরণে রেখে কিছু সংখ্যক মানুষ প্রকৃত ইতিহাস হতে বিমুখ না হয়ে সচেতনতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস। সেই ইতিহাসের আলোকে আলোকিত হয়ে আজ সময় এসেছে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোই বিশ্লেষণ করার।

সময়টা মধ্যযুগের বঙ্গদেশ। পাল রাজবংশের পতন ঘটিয়ে শুরু হলো দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন রাজাদের রাজত্বকাল। পাল রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ, তাই তখন বৌদ্ধমত হয়ে ওঠে বঙ্গের প্রধান ধর্মমত। তবে পাল রাজবংশের পতনের ফলে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মমত বঙ্গদেশ থেকে অবলুপ্ত হতে শুরু করে। এরপর সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে শুরু হয় হিন্দুধর্মের জয়যাত্রা। তবে এই বিজয়যাত্রা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি, ক্রমাগত বিজাতীয় আক্রমণের ফলে থমকে দাঁড়িয়েছে হিন্দুধর্মের জয়যাত্রা। প্রথমদিকে সেন রাজাদের পরাক্রমের ফলে কিছু আক্রমণ প্রতিহত করা গেলেও শেষের দিকে ইসলামি আগ্রাসনের শিকার হয়ে পতন ঘটলো সেন রাজবংশের। বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বাধীন ইসলামি সৈন্যদল বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। সেন রাজবংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন অতর্কিতে এই আক্রমণের সম্মুখীন হতে ব্যর্থ হন।

এরপর সূচনা হয় এক অরাজক পরিস্থিতির। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের এই সময়টিকে 'একশো বছরের অন্ধকারময় যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যে যুগের সূচনাতে শুধুই ধ্বংস, হত্যা, লুটপাট, নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধর্মান্তরণ। মধ্যযুগের বঙ্গে একদিকে তখন হিন্দুদের মধ্যে বীভৎস অস্পৃশ্যতা, জলঅচল জলসচল বিভাজন, স্বার্থান্বেষী সমাজপতিদের অমানবিক আচরণে দেশের উচ্চপদ থেকে শুরু করে সামান্য রাজকর্মচারী সকলেই তখন ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট অসংখ্য অসহায় মানুষ তখন প্রতিনিয়ত ধর্মান্তরিত হয়ে চলেছে, মাতৃজাতির সম্ভ্রম লুটিয়ে পড়ছে ধুলায়। নির্যাতিতের আর্ত চিৎকার আর রক্তের বন্যায় বঙ্গজীবন বিপর্যস্ত। নিপীড়িত মানুষের সামনে তখন দুটি পথ— হয় নিজধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ, নতুবা যবনের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ বিসর্জন।

মধ্যযুগের বঙ্গদেশে নবদ্বীপ ছিল ইসলামি শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। এর পিছনের ঐতিহাসিক

ফঃ ৩

কারণ হলো সেন রাজাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। নবদ্বীপ চিরকাল পণ্ডিতপ্রধান অঞ্চল। সে যুগে বিদ্যাচর্চার প্রধান স্থল মিথিলার পর যে স্থানটির নাম পণ্ডিত থেকে বিদ্যার্থী এমনকী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতো তা হলো নবদ্বীপ। বৈষ্ণব পদকর্তা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন :

নানা দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।।

নবদ্বীপ শাস্ত্রশিক্ষা ও শাস্ত্র আলোচনার ভূমি। শাস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের গন্তব্যস্থল ছিল এই প্রসিদ্ধ স্থান। তবে ইসলামি আগ্রাসনের ফলে নবদ্বীপ একটু একটু করে তার আদি গরিমা হারাতে শুরু করে, সূচনা হয় একশো বছরের এক অন্ধকার যুগের। যেখানে শাস্ত্র আলোচনা তো দূর, প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে দাঁড়ায়। এমত সময় সকলের মনের মধ্যে একটি মাত্র প্রার্থনা উদিত হলো— এবার স্বয়ং ভগবান নেমে আসুক এই ধরাধামে তাদের উদ্ধার কর্তারূপে, সকল অপশক্তির ধ্বংস ঘটিয়ে সূচনা করুন এক নতুন যুগের। ঠিক এমন সময় পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট থেকে আগত শান্তিপুর নিবাসী এক বিপ্লবী পুরুষ আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি আর কেউ নন শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, যাঁর পূর্ব নাম শ্রী কমলাক্ষ বেদপঞ্চানন। তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়ে সংগঠিত হতে বললেন। পীড়িত মানুষের তাপিত হৃদয়ে বরিষণ আনয়নের উদ্দেশ্যে বললেন— 'তোমাদের আর চিন্তা নেই, এবার আমাদের উদ্ধারকর্তা নেমে আসবেন এই ধরাধামে। আমি নিয়ে আসবো তাঁকে, তাঁর আগমনে সূচনা হবে এক নতুন যুগের যেখানে ধর্ম-রাজনীতি- সমাজনীতি মিলেমিশে সব একাকার হয়ে যাবে।' এবার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রত্যহ শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে একবুক জলে দাঁড়িয়ে চোখের জলে তুলসীপত্র ভিজিয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রী মদনগোপালের চরণ স্মরণ করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলতেন— 'হে প্রভু, তুমি কি এই আর্ত বেদনা শুনতে পাচ্ছো না! এসো প্রভু...শ্রীমদ্ভগবদগীতা'য় তুমি যে অঙ্গীকার করেছ—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

হে প্রভু তোমার এই অঙ্গীকারের বাস্তবিক রূপ প্রকাশ করার সময় এসেছে, তুমি অবতীর্ণ হও! শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সেই হুংকার ও করুণ আর্তিতে স্বয়ং ভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নবদ্বীপে আবির্ভাবের বিষয়ে তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন :

চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার
সিংহগ্রীবা সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে।।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একদিকে যেমন ভাবময় পুরুষ, অন্যদিকে তেমনি তিনি সমাজসংস্কারক মধ্যযুগীয় বঙ্গের আপামর বাঙ্গালি জাতির পরিত্রাতা আর ভক্তের হৃদয়ে তিনি ভক্তবৎসল ভগবান। নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবার হিন্দুধর্ম এবং মানবতার রক্ষার্থে এক ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধার ও ধর্মীয় সংস্করণ এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। সেই যুগের বঙ্গে ৩৬টি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কেউ জলঅচল, কেউ জলসচল, আবার কেউ অস্পৃশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর পারিষদ ও ভক্তদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক বিশাল আন্দোলন যার নেতৃত্বে স্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস (যবন হরিদাস), শ্রীনরহরি সরকার প্রমুখ। তাঁদের এক ও অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দুদের রক্ষা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক উত্থান, হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধার এবং মানবিকতার প্রতিষ্ঠা ও তার বাস্তবায়ন। মহাপ্রভু তাঁর পারিষদদের নিয়ে সমগ্র নবদ্বীপ ভ্রমণ করে সকলকে সংগঠিত করতে শুরু করলেন। তাঁর আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ছিল হরিনাম সংকীর্তন। মহাপ্রভু প্রকাশ্য রাজপথে ঘুরে ঘুরে আনন্দের সঙ্গে শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তন করার এই পন্থার নাম দিয়েছিলেন নগর সংকীর্তন। কৃষ্ণনামের হুংকারের সঙ্গে মানবপ্রেম ও ভগবত ভক্তির যে আন্দোলন শ্রীমন্ মহাপ্রভু শুরু করেছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন নামে সুপরিচিত।

আন্দোলনের প্রথম স্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সমাজপতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের পরাস্ত করে বার্তা দিলেন যে এবার সকলের জন্য হিন্দুধর্মের দ্বার উন্মুক্ত করে, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে সকলকে এক হতে হবে, সকলকে দিতে হবে সমান মর্যাদা। একদিকে ভক্তি, অন্যদিকে সমাজ সংস্কার ও ধর্ম রক্ষা— এই দুয়ের এক সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মহাপ্রভু এগিয়ে চললেন তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত করার জন্য। যে সামাজিক আন্দোলন মহাপ্রভু শুরু করেছিলেন তা দিনে দিনে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো। নবদ্বীপের দুই দুর্দণ্ড প্রতাপ অত্যাচারী নগর কোটাল জগন্নাথ ও মাধব (জগাই-মাধাই)-কে যখন অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ, তাদের হাতে মার খেয়েও কুপ্রবৃত্তি ও অসৎ আচরণ থেকে উদ্ধার করলেন তখন এই ভক্তি আন্দোলন একেবারে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো। সমাজপতি ও স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই আন্দোলনের বিরোধিতা করার বহু প্রচেষ্টা করেছিল। বিরোধিতার পন্থা স্বরূপ কখনও মহাতান্ত্রিক শ্রীগোপালচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ (চপাল গোপাল)-কে দিয়ে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদ ও ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ির সম্মুখে মদিরা মাংস রাখা, উদ্দেশ্য শ্রীবাস পণ্ডিতকে সমাজের চোখে ধর্মের নামে প্রতারক প্রমাণ করা, আবার কখনো তৎকালীন মুলুকপতি মৌলানা সিরাজুদ্দিন (চাঁদ কাজি)-র কাছে মিথ্যা নালিশ জানিয়ে, যাতে তিনি কঠিন হাতে এই আন্দোলনকে দমন করে দেন। মহাপ্রভুর এই ভক্তি আন্দোলন সেইদিন একেবারে রাজনৈতিক আন্দোলনে তথা বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল যেদিন সারা নবদ্বীপে হরিনাম সংকীর্তন বেআইনি এবং সুলতানি শাসন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন নাম চাঁদ কাজি।

ঘোষণার পর শুরু হলো আন্দোলন-কারীদের শনাক্ত করে পাশবিক নির্যাতন এবং

সমগ্র আন্দোলনের উপর নেমে এলো রাজরোষ। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহাপ্রভু সমগ্র নবদ্বীপবাসীকে নিয়ে গড়ে তুললেন আইন অমান্য আন্দোলন। শত শত মানুষকে এক একটি দলে বিভক্ত করে সকলের হাতে প্রজ্বলিত মশাল তুলে দিয়ে সন্ধ্যাবেলা শুরু হলো সংকীর্তন। মহাপ্রভু ও তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদরা এক একটি দলের নেতৃত্ব দিলেন। যে সব ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল সেসব আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সনাতনী প্রথা মেনে সাজিয়ে তোলা হলো, যেসব শ্রীখোল করতাল ইত্যাদি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তা নতুন করে সারিয়ে শুরু হলো সুলতানি আইন অমান্য। এবার উত্তেজিত এই জনসমুদ্র নিয়ে মহাপ্রভু হাজির হলেন কাজির বাড়ির সামনে। সেখানে গিয়ে আক্রমণাত্মক জনতা কাজির রংবাহারি ফুলের বাগান এবং বাড়িঘর ভাঙচুর শুরু করলেন, কেউ কেউ ছুটে গেলেন জ্বলন্ত মশাল দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে সব ধ্বংস করতে। এই আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে যে রাজকর্মচারীরা ছুটে এল তারাও ভয় পেয়ে এই আন্দোলনের দলেই মিশে গেল। কিছুক্ষণ এইভাবে ধ্বংসলীলা চালানোর পর ভীত সন্ত্রস্ত কাজি তাঁর মহল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নিজের পরাজয় শিকার করে মাথার মুকুট মহাপ্রভুর পায়ের কাছে রাখলেন এবং ঘোষণা করলেন আজ থেকে আর কোনোদিন কেউ হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করতে পারবে না আর যে এই দুঃসাহস দেখাবে তাকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহাপ্রভু-সহ আন্দোলনকারীদের বিজয় হলো। বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ চাঁদ কাজি মহাপ্রভুর হাতে তুলে দিলেন এক শ্রীখন্ডা ও নিশান। বঙ্গভূমি তথা ভারতবর্ষে সংগঠিত হলো প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন।

নবদ্বীপের মাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবদানের কথা বলতে গেলে যে বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তা হলো সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে সমান অধিকার প্রদান এবং হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম রক্ষা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আর এক নাম 'পতিত-উদ্ধারণ'! কারা এই পতিত? কেনই-বা তাদের পতিত বলা হতো? শ্রীমন্ মহাপ্রভু কী করেছিলেন তাদের জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বঙ্গ ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে যেখানে পাল রাজাদের পতন ঘটিয়ে শুরু হচ্ছে সেন রাজাদের শাসন।

পাল রাজত্বের অবসান ঘটল। শুরু হলো সেন রাজত্ব। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, ফলে সমাজে বৌদ্ধ ধর্মাচরণের প্রভাব ও আধিপত্য ছিল সর্বস্তরে। তবে সেন রাজারা ছিলেন তার ঠিক বিপরীত, দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু ঘোর বৌদ্ধ বিরোধী, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। এবার বৌদ্ধ প্রভাবকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে সেন রাজারা বঙ্গদেশে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। এবার সে কাজ শুরু হলো তৎপরতার সঙ্গে। এই বিষয়ে যাঁর নাম না করলেই নয় তিনি হলেন রাজা বল্লাল সেন। বল্লাল সেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এই কাজের জন্য কনৌজ থেকে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে বঙ্গে নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য একটাই— বৌদ্ধ সংস্পর্শে থাকা সমাজকে সংস্কার করিয়ে হিন্দু সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সেই বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কুলীন ব্রাহ্মণরা দেশ জুড়ে শুরু করলেন হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের এক মহাযজ্ঞ। তবে বল্লাল সেনের পর লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালেই সেন রাজত্বকে বিদায় নিতে হলো। শুরু হয়ে গেল ইসলামি শাসন। এত অল্প সময়ে অগোছালো সমাজকে গুছিয়ে সুশৃঙ্খল শাসনে আনা সম্ভব হয়নি ব্রাহ্মণদের পক্ষে। তাই কিছু সংখ্যক মানুষ পেল সামাজিক অধিকার আর যাদের ফিরিয়ে আনা হলো না, তারা পড়েই রইলো তাদের সেই পুরানো স্থানে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সকল নবদ্বীপবাসীকে নিয়ে উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী- অজ্ঞানী, মূর্খ-পণ্ডিত ভেদাভেদ দূর করে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল বড়ো বৈচিত্র্যময়। সেখানে যেমন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল রাজরোষ্য, ঠিক তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে প্রতি উত্তর দিয়েছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো বঙ্গের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র রয়েছে কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অনুপস্থিত। তবে বঙ্গের যে ক্ষত্রিয় ছিল তারা দেশজ ক্ষত্রিয়— হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউরি। বঙ্গজীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া প্রতিটি বাঙ্গালি সন্তানের শৈশবে খেলার ছলে বলা সেই ছড়া— 'আগে ডোম বাগে ডোম, ঘোড়ায় ডোম সাজে' আজও সমান ভাবে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। আর বাকি থাকল বৈশ্য, তারা ছিল বৌদ্ধ মতাবলম্বী। তাই বল্লাল সেনের ব্যবস্থায় যে বর্ণাশ্রম প্রথায় হিন্দু সমাজ গঠিত হয়েছিল সেখানে ছিল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। শূদ্রের আবার দু'টি ভাগ— সৎ শূদ্র এবং অসৎ শূদ্র। যাদের জল আচরণীয় তারা সৎ শূদ্র, আর যাদের জল অচল তারা অসৎ শূদ্র। তারা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, সকলের ঘৃণার পাত্র। রাজত্ব পরিবর্তনের ফলে বঙ্গের যারা আদি শরিক ছিল তারা হয়ে গেল পতিত, চলে গেল সমাজের নীচু স্তরে। এবার এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, সমাজে যাদের পতিত বলা হচ্ছে, যাদের উদ্ধার কাজে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই কি হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ছিলেন? এই বিষয়ে মনীষী বিনয় কুমার সরকার একটি বিশেষ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'সে সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ কোনোটাই ছিল না, ছিল এই দুই ধর্মের বাইরে নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে। মোল্লা-মৌলবিরা তাদেরই ধর্মান্তরিত করেছিল। মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ছিল তাদের হিন্দু সমাজভুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব আন্দোলন। তাই তিনি ইসলাম প্রচারকদের প্রতিদ্বন্দ্বী।'

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে একদিন শ্রীঅদ্বৈত

আচার্যর আলোচনা হলো :

'ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন প্রচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার।।
অদ্বৈত বলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খের সে দিবা।।
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুংকার।
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।।
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত— শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সকল নবদ্বীপবাসীকে নিয়ে উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী- অজ্ঞানী, মূর্খ-পণ্ডিত ভেদাভেদ দূর করে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল বড়ো বৈচিত্র্যময়। সেখানে যেমন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল রাজরোষ, ঠিক তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে প্রতি উত্তর দিয়েছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। তবে এখানে একটি বিশাল প্রশ্ন রয়ে যায়, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপের মাটিতে যে আন্দোলন সুসংগঠিত করেছিলেন তা কেমন ছিল— সশস্ত্র বিপ্লব নাকি অহিংস আন্দোলন?

বঙ্গের বিশিষ্ট অনুভবী বৈষ্ণব সাধক ও নাম প্রচারক শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের একটি কীর্তনের আক্ষর থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আন্দোলনটি কেমন ছিল—

'...শ্রীরাম আদি অবতারে
ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে,
কত অসুরে করিলো সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলো
প্রাণে কাওরে না মারিলো,
কোল দিয়া নাম প্রেম দিল।।...'
(শ্রীগুরু কৃপার দান— শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ)

এই ছিল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যুগধর্ম। অস্ত্র নিয়ে অস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়, আবার অহিংসভাবে মার খাওয়াও নয়— দুয়ের মাঝে এমন এক পন্থা যেখানে সাংগঠনিক শক্তি আছে কিন্তু অস্ত্র নেই, মুখে কৃষ্ণনাম করে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দূর করে আনন্দের সঙ্গে নৃত্য ও গীতে সকল সনাতনী সত্তার এক করার পন্থা আছে, আবার আক্রমণ হলে আক্রমণকারীর চোখে চোখ রেখে জবাব প্রদানও আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সকলের দ্বারে দ্বারে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জনসংযোগ করতে শুরু করলেন। তাঁর এই কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র ছিল মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি শ্রীবাস অঙ্গন। এই শ্রীবাস অঙ্গনেই একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে ডেকে বললেন—

'...দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া,
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
কীর্তন কহিল এই তোমা সবাকারে,
স্ত্রী পুত্র বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে।।...'
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত— শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ নিয়ে আড়ম্বর নয়, পুরোহিতের কৃপাপ্রার্থী হওয়া নয়, আনন্দের সঙ্গে শুধু ভগবত নাম করা এই ছিল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমাজ কল্যাণের মূল অস্ত্র। তাঁর এই আন্দোলনে প্রথম সারিতে যাদের স্থান হয়েছিল তারা হলেন স্ত্রীলোক ও শূদ্র, কারণ এরা চিরকাল নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিত তাই, এদের দিয়েই আন্দোলনের সূচনা। আদিকাল থেকে চলে আসা অচলায়তনের গণ্ডি পেরিয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছিলেন— 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ' (ব্রাহ্মণ সে ব্রাহ্মণ নয় যদি 'হরিভজন' অর্থাৎ স্বজাতীয় আচরণ না করে আর চণ্ডাল অর্থাৎ সামাজিক ভাবে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেও যিনি হরি ভজনা করেন তিনি দ্বিজ অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

ঠিক এমনিভাবে জনসংযোগ করতে করতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হিন্দু সমাজকে সুসংহত করে হিন্দুধর্মের বিজয় নিশান উড়িয়ে এগিয়ে চললেন। তবে তাঁর আর নবদ্বীপে থাকা হলো না। কেন হলো না তার একটি সুন্দর ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর আমরা পাই অধ্যাপক অজিত দাসের লেখা একটি ধারাবাহিক রচনায়। সেখানে তিনি লিখলেন, 'শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে নবদ্বীপে থাকা সম্ভব হলো না। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজ বিচলিত হয়ে তাকে চরম আঘাত হানতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। অবশ্যই সেদিনের সংঘাতটা খুব সহজ আকারের ছিল না। ব্রাহ্মণ সমাজ চেয়েছিল কাজিকে কাজে লাগিয়ে কার্যোদ্ধার করতে। কাজির ভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন প্রচার দমিত হয়ে যাবে। সাধারণ নবদ্বীপবাসী আর মাতামাতি করবে না কীর্তন নিয়ে। কিন্তু গৌরাঙ্গের সাহস ও সংগঠনশক্তি কাজিকে দমন করতে সমর্থ হলো। বিপন্ন ব্রাহ্মণসমাজ তখন ছাত্র সমবায় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। এই সংগঠনের জোরে গৌরাঙ্গ কাজিকে দমন করতে পেরেছেন। এবার ছাত্র সমবায় শ্রীগৌরাঙ্গকে আঘাত হানবে। সেদিন তা যদি হতো, অর্থাৎ গৌরাঙ্গের ওপর যদি আঘাত আসত, তাহলে তাঁর সংগঠিত বিপুল শক্তি অবশ্যই ব্রাহ্মণ সমাজের ওপর প্রত্যাঘাত হানত এবং তা এক ভয়াবহ দাঙ্গার রূপ নিত। আর তখনই অপমানিত কাজি প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগে গৌরাঙ্গের ভক্তি-আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলত সহজেই। কে জানে ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রের পিছনে এমন পরিকল্পনা ছিল কিনা!'

তবে শ্রীগৌরাঙ্গের বুদ্ধিমত্তায় সে সম্ভাবনার পথ বন্ধ হলো। তিনি গৃহত্যাগ করলেন, কাঞ্চননগরে (আজকের কাটোয়া) গিয়ে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস নেন এবং পুরীধামে গমন করেন। মাত্র তেরো মাস (১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিক) শ্রীমন্ মহাপ্রভু নবদ্বীপে ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নবদ্বীপে তাঁর ভাব প্রকাশ করে সূচনা করেছিলেন এক নতুন দিনের, যে দিনের বাস্তবিক রূপ আজ আমরা দেখতে পাই। সকল মানুষ তার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমান, সকলের এক অধিকার, সবার একটি মাত্র পরিচয় আমরা বঙ্গবাসী, আমরা ভারতমাতার বীর সন্তান।

তথ্যসূত্র :

১. বৈষ্ণব পদকর্তা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'।
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
৩. শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের 'শ্রীগুরু কৃপার দান'।
৪. Speeches of Benoy Kumar Sarkar, Krishnagar College centenary commemoration volumes.
৫. অধ্যাপক অজিত দাস রচিত 'জাতবৈষ্ণব কথা'।

জগদ্‌গুরু সেদিন কল্পতরু, খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে সনাতনীর স্রোত

বিদ্যুৎ মুখার্জী

১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে রূপায়িত হলো মেকলে-প্রসূত ও প্রবর্তিত ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা। এটি খ্রিস্টীয়করণের পথে ঔপনিবেশিক ভারতের মানস-দখলের পরিকল্পনা। ঠিক পরের বছরই সেই ছন্দপতন! ১৮৩৬ সালে যে হিন্দু মহাপুরুষের আবির্ভাব, ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি বিকেল তিনটেয়, তিনিই তাদের প্রথম দিনটি ঐশী সৌন্দর্যে দখল করে নিলেন। তারপর ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর আঁটপুরে এবং ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীতে এলেন তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, বড়োদিনটিকেও একইভাবে অতিক্রম করে যেতে। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে সনাতনী সংস্কৃতির স্রোত বইতে থাকবে।

১ জানুয়ারি হলো কাশীপুর উদ্যানবাটিতে এক অবতারপুরুষের কল্পবৃক্ষ হয়ে ওঠার দিন। তাপিত সংসারে নিমজ্জিত মানুষের ইচ্ছেপূরণের দিন। জীবোদ্ধার করে স্বর্গীয় মহিমা বিতরণের দিন। দক্ষিণেশ্বর নাটমন্দিরের জনবহুল সভায় ভৈরবী ব্রাহ্মণী একদিন তাঁকে অবতার রূপে প্রচার করেছিলেন। সেই তিনিই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু রূপে কলকাতার উদ্যান মালঞ্চে তামসভেদী আলোকের বেশে অবতীর্ণ হলেন। কেমন সে রূপ? 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-তে কবি অক্ষয় কুমার সেন লিখছেন—

'শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল।।
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর।।
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি।।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ। সকল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পোশাকে সর্বাঙ্গ আবৃত হয়ে দোতলা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে সঙ্গে নিয়ে নামলেন। ছুটির দিন। তাই উদ্যানে অনেক ভক্ত এসেছেন। ঠাকুরের জন্য রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হয়ে একতলার ঘরে নরেন্দ্রনাথ ও কয়েকজন সেবক তখনো নিদ্রিত। ঠাকুর একাকী বেড়াচ্ছেন সুড়কির রাস্তা ধরে, পুষ্করিণী হয়ে ফটক পর্যন্ত। হঠাৎ গিরীশকে প্রশ্ন করছেন, 'তুমি যে আমার সম্বন্ধে এত বলে বেড়াও, তুমি কী দেখেছ বা বুঝেছ?' তৎক্ষণাৎ বুঝে গেছেন গিরীশ, ঠাকুর আজ কী বলতে চাইছেন! শ্রীরামকৃষ্ণের পদতল আশ্রয় করে তিনি প্রত্যুত্তর করলেন, 'ব্যাস বাল্মীকি যাঁরা ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি কী আর বলতে পারি।' সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো ঠাকুরের, ভাবের গভীর সমাধিতে মগ্নচেতন হলেন, মুখমণ্ডলে নির্গত হলো অপরূপ দিব্যপ্রভা, রূপমাধুরী সর্বশরীর থেকে বিনির্গত হতে লাগলো। ভক্তরা বিমুগ্ধ, অস্ফুট। গিরীশ ঐশী-উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, বারবার ঠাকুরের চরণধূলি গ্রহণ করলেন। চীৎকার করে ডাকলেন সবাইকে, 'তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আজ শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন এবং সকলকে বর দিচ্ছেন।' ছুটে এলেন সবাই। ভক্তরা ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্চারণ করলেন 'জয় রামকৃষ্ণ'। বুঝলেন আজ আর অবতারবরিষ্ঠ নিজেকে লুকোবেন না। আজ আর ভগবানের ধরাধামের বার্তা অপ্রকাশিত থাকবে না। স্বয়ং ভগবান আজ 'সব হয়েছেন'। আজ তিনি কল্পতরু, আজ পুরো বিশ্ব রামকৃষ্ণময়। আজ পাপীতাপী সকলের অভয়পদে আশ্রয় লাভের দিন। ১ জানুয়ারি।

ঠাকুর ক্রমে বাহ্যদশায় ফিরে আসছেন। এবার হাসছেন তিনি। ভক্তদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে বলছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।

সেই মধুর বাক্য কেবল সেই বেলাকার নয়, সেই দিনের জন্যও নয়! শাশ্বতকালের চৈতন্যবার্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল ১ জানুয়ারি খ্রিস্টীয় আনন্দের এক দিনে। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। ...কোনো এক অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, মাতার আহ্বান করিতেছেন!' কারও অধ্যাত্মনেত্র গেল খুলে, কারও ভাগ্য, কেউ পেলেন সমাধি লাভের বরমাল্য, তো কেউ পেলেন অর্থসম্পদ। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো পুষ্পচয়ন করে মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করছেন। একে একে তাদের সকলকে আশীর্বাদ দিয়ে ধন্য করলেন পরমপুরুষ। আর ধন্য হলো সনাতনী হিন্দু-সংস্কৃতি। ইংরেজি বছরের প্রথম দিনটিই ভারতীয় সাধুর কাছে পরাজিত হলো। যতদিন যাবে সমগ্র বিশ্বই কল্পতরু বৃক্ষের ফললাভ করবে। আর সুবাস ছড়াবে হিন্দুধর্মের। জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ। ■

মহাপ্রভু অধ্যাত্মরাজ্যে প্রথম গণতন্ত্রের পূজারি

ড. সর্বাণী চক্রবর্তী

‘কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।।
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।।’

—কাজির নিষেধকে অগ্রাহ্য করে ভক্তগণকে মহাপ্রভু সগৌরবে বললেন— ‘দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।’ আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে ‘হরিবোল’ শব্দে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। মানুষ অবাক বিস্ময়ে জেনেছিল যে তাদের বোবা-কালার মতো শুনতে বলছে না কেউ, অন্তরের আকুতিকে আত্মার উচ্চারণে রূপান্তরিত করতে বলছে।

শব্দের জ্যোতি যদি সংসার জুড়ে না জ্বলত তাহলে পৃথিবী ডুবে যেত ঘন অন্ধকারে। সেই অন্ধকার থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাবার জন্যই মহাপ্রভু ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কালোকে ফর্সা করে আপন সত্তায় ধারণ করে মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং ভারতবর্ষ। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর মহত্তম গ্রন্থ ‘শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে’ রাধা-কৃষ্ণকে যুগল মূর্তিতে পূজা করেছেন।

এই যুগল সত্তার উদ্‌যাপনই একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়ে নেয় ‘অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম, হয় যায় রয়।’ মা সারদা তাই কি বংশীধ্বনি শুনতে পেতেন দক্ষিণেশ্বর থেকে?

কেবলমাত্র ভক্তির প্রাবল্যেই মহাপ্রভু অসাধারণ নন, গয়া থেকে (১৫০৮ খ্রি.) ফিরে পরবর্তী দু’বছর নবদ্বীপে বাসকালে তিনি ছিলেন অসাধারণ জনসংগঠক। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেইশ বছর। ওই যুবক বয়সে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন তৎকালীন শাসনকর্তা চাঁদ কাজির নির্দেশের বিরুদ্ধে। প্রবন্ধের শুরুতে কাজির তর্জন-গর্জন বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে শ্রীচৈতন্যের জনআন্দোলন মানবকেন্দ্রিক হলেও তা মানুষের মনকে পার্থিব জগৎ থেকে ভক্তিমার্গের দিকেই আকৃষ্ট করেছিল। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন ধর্মীয় জাগরণের পথ ধরেই ভারতবর্ষকে নবজাগৃতির মন্ত্র দিতে হবে। তাই দেখি সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থাপন করে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে একই মঞ্চে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই সর্বজনীন মনোভাবই ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলনীতির প্রবল বিপরীতধর্মী। তাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অমোঘবাণী— ‘নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা’— অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোনওটাই নই, নই ব্রহ্মচারী বা গৃহী বা বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী। স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়— ‘আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে।’

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তাঁর প্রেমভক্তি প্রচার। গান্ধীজী একসময়ে পৃথিবীকে অহিংস আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন; তার চারশো বছর আগে চাঁদ কাজির আদেশের বিরুদ্ধে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীকে একযোগে হরিনাম সংকীর্তন করতে সংগঠিত করেছিলেন, সেটাই হলো অহিংস আন্দোলনের প্রাথমিক রূপ। সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে আছে ক্রোধ; অস্ত্রবিহীন আন্দোলনে আছে প্রতিরোধ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে প্রেমধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে আছে শুধু হৃদয়ের

আবেগ। প্রেমের যে বিপুল শক্তি তা তিনি বুঝিয়েছিলেন সমগ্র ভারতবাসীকে। সেই প্রেমেই 'জগাই মাধাই পাপী যাতে উত্তরিলা।' তাই তো মহাজনগণ বলে থাকেন— 'ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যারে তারে দিলা!' এদিক থেকে দেখতে গেলে মহাপ্রভু অহিংসধারারও প্রথম পথিকৃৎ। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের এই যে মহামিলন একে আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র বললে খুব ভুল বলা হয় কি? তাই তো পদকর্তা মনের আনন্দে গেয়ে ওঠেন— 'সব অবতার সার গোরা অবতার।। এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর।।' এখানেই কবি তাঁর লেখনীকে আর একটু এগিয়ে বলছেন— 'চল মুনি চলি যাই। সেই মহাপ্রভু ঠাঁই, সকল ভুবনে যিনি শিক্ষাগুরু।।'

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বঙ্গে নারী জাগরণের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় বঙ্গের নারীরা সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, তখন অনেক মহিলাই শিক্ষিতা ও ধার্মিক হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীচৈতন্যদেবের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী, শ্রীবাস পণ্ডিতের স্ত্রী মালতী দেবী, শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক বৃন্দাবন দাসের মা নারায়ণী প্রমুখ। এই সময় পুঁথি লেখা বা নকল করা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের উপার্জনের একটি পথ ছিল। এক কথায় নারী জাগরণের 'প্রভাতী আলো' আমরা দেখতে পাই শ্রীচৈতন্যের যুগে। এহো বাহ্য, তিনি এককথায় বঙ্গকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন। পুরুষদের নামের আগে 'শ্রী' আর মহিলাদের ক্ষেত্রে 'শ্রীমতী' যুক্ত করার রীতি তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। পুরীকে 'শ্রীক্ষেত্র' অভিধা তাঁরই দেওয়া।

এইভাবে পঞ্চদশ শতকের বঙ্গকে সবদিক থেকে শ্রীমণ্ডিত করে তিনি নবজাগরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যান তিনি।

তাঁরই আন্তরিকতায় একজন যবনও পান 'মধু মাখা কৃষ্ণনাম'। এ কী কম কথা! সেই যুগে একজন বিধর্মী ভক্তের জন্য মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ নিয়ে গেলে সেই যবনভক্ত উত্তর দেন— 'সংখ্যা কীর্তন না পূরয়।' প্রভু বললেন সেই যবন হরিদাসকে— 'সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর।' তদুত্তরে ভক্ত হরিদাস নিজেকে 'হীন জাতি' ও 'অধম পামর' বলে পরিচয় দিচ্ছেন। আর সেই হরিদাসের যখন ভবলীলা সঙ্গে হলো তখন স্বয়ং মহাপ্রভু নিজে হরিদাসকে 'সমুদ্রজলে স্নান করাইলা'। আর বললেন— 'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা।' এখানেই শেষ নয়, মহাপ্রভু হরিদাসের মহোৎসব পালন করলেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। একবার পাঠক ভেবে দেখুন সেই সময়ের কথা। সামাজিক অচলায়তনকে সঠিক পথের দিশা দিতে ধ্রুবতারার ভূমিকায় দেখা গেল শ্রীচৈতন্যদেবকে। এক নতুন জীবন বোধের নতুন চৈতন্যের জোয়ারে ভেসে গেল সমগ্র ভারত। তবুও শ্রীচৈতন্যদেব শুধু একজন ধর্মগুরু নন, প্রচারক নন, তিনি হলেন এক বিশাল ধর্ম আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এখানে একটা স্মরণযোগ্য— ধর্ম আর ধর্ম আন্দোলনের বেশ পার্থক্য আছে। দার্শনিক হোয়াইট হেড বলেছেন তাঁর রচনার একস্থানে— ধর্ম হলো নিজেকে নিয়ে, নিজের একাকিত্ব নিয়ে। তাই ধর্মে সব সময়ই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ একটা যৌথতার টান চোরাস্রোতের মতো কাজ করে যায়। আর এই ধর্মে কখনও কখনও গ্লানিও প্রবেশ করে, তখন তার মূল সত্য হারিয়ে যায়। তখন ধর্ম দুষ্কৃতীর হাতিয়ারে পরিণত হয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক শোষণ যন্ত্রে পরিণত হয়। আর সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তখন এক নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দেন— 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ'। আর এই নতুন শক্তিকে অবলম্বন করে দানা বাঁধে ধর্ম আন্দোলন। শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এঁরা হলেন ধর্ম আন্দোলনের ঋত্বিক, কিন্তু সংস্কারক নন। প্রভু নিত্যানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ হলেন সংস্কারক। মোটকথা, ধর্ম শুধু নিজেকে নিয়ে, আর ধর্ম আন্দোলন হলো বহুকে নিয়ে। এটাই পরিবর্তিত হয়ে পরিণত রূপে গড়ে ওঠে সামাজিক আন্দোলনে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে— 'People are people only because of people.' এর কোনো হদিশ নব্যস্মৃতি দিতে পারেনি। সেযুগে স্মৃতিকাররা শাস্ত্রীয় বিধান নিজেদের স্বার্থে কঠোর থেকে কঠোরতর করেছেন। সাধারণ মানুষ সরে গেছেন অনেক দূরে।

সংস্কৃতির বিকাশ হলেই একটি জাতির চৈতন্য জাগরণ সম্ভব। মধ্যযুগে যা প্রধানত শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারাই হয়েছিল। নবজীবন ছিলেন তিনি, এর মূলে ছিল অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা। তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা জাতির আত্মগৌরব। ■

জাতির চৈতন্য জাগরণে সাধু -

রাজদীপ মিশ্র

ভারতবর্ষে জাতির চৈতন্য জাগরণে যেসব সাধুসন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— আদি শঙ্করাচার্য, স্বামী বিদ্যারণ্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর মহারাজ স্বামী প্রণবানন্দজী প্রমুখ। এই কাজে বর্তমানকালেও বহু সন্ত সক্রিয় আছেন।

আলোচনার সূত্রপাত ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের গুরু সমর্থ স্বামী রামদাসকে নিয়ে করা যেতে পারে। সাতারা দুর্গ জয় করার পর শিবাজী তাঁর গুরুর জন্য সজ্জনগড়ে এক আশ্রম নির্মাণ করে দেন। গুরুর প্রেরণায় একদিকে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা শিবাজী মহারাজ তুর্কি, ইরানি, হাপসি, বাগদাদি এবং চতুর ইংরেজ আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হচ্ছিলেন এবং অপরদিকে গুরু সমর্থ স্বামী রামদাস জনজীবনে রাষ্ট্রচেতনা জাগরণের কাজে ব্রতী ছিলেন। প্রায় ৭০০ বছর ধরে বিদেশি আক্রমণকারীদের অত্যাচারে ভারতীয়দের জীবন তখন জর্জরিত। যে ভগবানকে তারা রক্ষাকর্তা বলে মনে করতেন, সেই ভগবানের মূর্তি তাদের সামনেই ভাঙা হতে লাগলে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বারো বছর ধরে ভ্রমণ করার সময় হিন্দুদের দৈন্যদশা নিজের চোখে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, হিন্দুদের হেরে যাওয়ার মানসিকতা তাদের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কীভাবে স্বধর্মের রক্ষা করা যাবে? অত্যাচারিত হিন্দুদের মুখে রামনাম উচ্চারণ করাতে গেলে শক্তি সাধনার প্রয়োজন, তাই তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রীহনুমানের মন্দির স্থাপন করেন। 'জয়জয় রঘুবীর সমর্থ' ধ্বনিতে তিনি আপামর হতোদ্যম হিন্দুদের মনের মধ্যে সাহসের সঞ্চার সৃষ্টি করলেন। তিনি মহা আড়ম্বরের সঙ্গে শ্রীরামনবমী উৎসব প্রচলন করেন।

শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর পর শম্ভাজী মহারাজকে স্বামী রামদাস যে সাবধানতামূলক ও উপদেশাত্মক চিঠি লেখেন তা পরবর্তী মারাঠাদের ক্ষেত্রে খুব লাভদায়ক হয়। অটক থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভারতে স্বরাজ্যের গৈরিকধ্বজ স্থাপিত করার পর সমর্থ স্বামী রামদাসের কল্পনা বাস্তব রূপ পায়।

সমাজ জাগরণের জন্য, মুসলমান অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দুজাতির মনে ধর্মবোধ জাগরণের জন্য এবং সম্মিলিত শক্তি নির্মাণের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নামসংকীর্তনের প্রচলন করেন। চাঁদ কাজির নির্দেশে তার সেনারা যখন নামসংকীর্তনের খোল ভেঙে দিল, কীর্তন বন্ধের নির্দেশ দিল, তখন নিমাই পণ্ডিত সমগ্র নবদ্বীপবাসীকে নিয়ে মশালমিছিল সহকারে নামসংকীর্তন করতে করতে ধর্মরক্ষার জন্য কাজির প্রণীত আইনকে অমান্য করে তার বাড়ি ঘেরাও করেন। তৎকালে হিন্দুদের মধ্যে যে গোঁড়ামি ছিল তা দূর করে তিনি দবির খাস এবং সাবার মল্লিককে হিন্দুধর্মে পরাবর্তন করিয়ে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামকরণ করেন। 'যাঁরা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁরা সবাই আমার আপন, আমার ধর্মের প্রিয়জন'— এই বার্তাকে সামনে রেখে যবন হরিদাসকে তিনি বুকে টেনে নেন।

সমাজের চৈতন্য জাগরণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে শক্তি উপাসনায় রত থেকেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেব যুবকদলকে ত্যাগের আদর্শে দীক্ষিত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণনন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ ১৬ জন যুবককে নিজ সান্নিধ্যে রেখে রামকৃষ্ণদেব ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁরা ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে সমাজের চৈতন্য জাগরণ ও হিন্দুত্বের প্রচার প্রসারের কাজে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় রামকৃষ্ণদেব ছিলেন 'ভারতের আত্মা'।

বিপ্লবী নলিনীকান্ত কর, বাঘাযতীন, শ্রীঅরবিন্দ, মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন দাস, বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। জাতির জীবনে স্বদেশ চেতনার পাশাপাশি তিনি জাতিকে দিয়েছিলেন জাগরণের মন্ত্র। তিনি বলেছিলেন— 'হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারী জাতির আদর্শ— সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের— নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না— তোমার সমাজ— সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না-নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।' গর্বিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ খ্রিস্টান মিশনারিদের মতপ্রচারের পেছনে অন্য উদ্দেশ্যের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন— 'মিশনারিরা ভারতে গিয়া শুধু দুইটি কাজ করেন— যথা দেশবাসীর পবিত্রতম বিশ্বাস সমূহের নিন্দা করা এবং জনগণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া। ...ভারতবর্ষে গিয়া এখন মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের কোনো প্রয়োজন নাই। গুরুতর প্রয়োজন এখন লোককে কারিগরি ও সামাজিক শিক্ষাদান। ধর্ম বলিতে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা হিন্দুদের আছে।' (বাণী ও রচনা ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০)

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, যোগী, ঋষি অরবিন্দ বোমা মামলায় আলিপুর কারাগারে বন্দি অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। জেল থেকে মুক্তি লাভ করে সর্বপ্রথম জনগণকে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক উত্তরপাড়া অভিভাষণে। সমাজের

সন্তদের ভূমিকা অনন্য

চৈতন্য জাগরণের জন্য এটি একটি জীবন্ত দলিল— ‘শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্বের জন্যই হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের প্রয়োজন। হিন্দুধর্মই ভারতের জাতীয়তা। কারণ হিন্দুই একমাত্র অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাণীবহ। Sanatan Dharma is life itself. It is for the Dharma and by the Dharma that India exists.’ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন মনের আরাম, প্রাণের শান্তি খুঁজতে পৌঁছেছিলেন বোলপুরে, আশ্রম গড়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। ঠিক তেমনই পুরোপুরি ঈশ্বর সন্ধানে না হলেও মনুষ্যত্বের মঙ্গল কামনায়, ভারতবর্ষের উন্নতির কামনায় শ্রীঅরবিন্দ ধীরে ধীরে ‘dead city’ পণ্ডিচেরীতে গড়ে তুললেন সেই প্রাণের শান্তি, মনের আরামের আবাসস্থল— অসহায় মানুষের নির্ভরতার জায়গা। তিনি বলেছেন— ‘I had purposefully retired here in order to pursue my yogic sadhana.’ যেখানে উন্মুক্ত জীবন, যুব আন্দোলন, সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা, শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুশীলন— জাগ্রত প্রাণের চিহ্ন কিছু ছিল না, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ আর গুণ্ডার দলের আস্ফালন ছিল— সেই পণ্ডিচেরী একদিন ফরাসি কন্যা শ্রীমা আর ঋষি অরবিন্দের সনাতন ধর্মচিন্তায় পরিণত হলো এক মহাধ্যানস্থানে। এখানে অরবিন্দ হয়ে উঠেছিলেন পূর্ণ ঋষি।

পূর্ববঙ্গের গ্রামে জন্মগ্রহণ করার ফলে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতপাত, ছোঁয়াছুত ইত্যাদিতে শতধা-বিভক্ত হিন্দু সমাজের দুর্দশা। হিন্দুদের আত্মচেতনা জাগ্রত করার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে স্থাপন করেছিলেন হিন্দু মিলন মন্দির। সকল শ্রেণীর হিন্দুকে সংগঠিত ও আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা, নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে বিধর্মীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে হিন্দুদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন। হিন্দু সম্মেলনগুলোতে গুরুগোবিন্দ সিংহ এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ছবি রেখে তিনি হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। জাতির নাম না ধরে তিনি সবাইকে হিন্দু বলে উল্লেখ করতেন। তিনি হিন্দুকে ‘হিন্দু’ বলে পরিচয় দিতে বলতেন। তিনি বলতেন— ‘আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র জনসাধারণকে আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, আমি হিন্দু জপ করাবো।’ ১৯৩৭ সালের পর থেকে বঙ্গপ্রদেশের রাজনীতিতে অহিন্দুদের আধিপত্য বাঙ্গালি হিন্দুজীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। প্রতিকার স্বরূপ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ হিন্দুরক্ষীদল গঠন করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় হিন্দুজাতির জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জাতীয় নেতা নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁর আশীর্বাদে শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তানের গ্রাস থেকে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে এনেছিলেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা কারোর অজনা নয়। অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের করুণ কাহিনি বেমালুম চেপে যেত। ‘কেরালা স্টোরি’, ‘কাশ্মীর ফাইলস্’-এর মতো সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাগুলি অতিরঞ্জন বলে প্রচারিত হচ্ছিল। সমাজে বিভাজন সৃষ্টিকারী বলেও এইসব সিনেমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছিল। দুর্ভাগ্যবশত আজ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে, তা যেন সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সর্বত্র বিক্ষোভ চলছে। প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার এই বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে। বর্তমান মিডিয়া এই অত্যাচারের কাহিনি দেখাতে বাধ্য হয়েছে। এই হিন্দু নিপীড়ন ও হিন্দু নিধন যজ্ঞের প্রতিবাদে ওপার বঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সাধুসন্তরাও প্রতিবাদে সরব। তাঁরা বিশাল সংখ্যায় পথে নেমে প্রতিবাদ করছেন। দিব্যজ্ঞানী সাধুরা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে তাঁদেরও যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে তা তাঁরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। হাজার হাজার সাধু জমায়েত হয়ে ধিক্কার সমাবেশ করছেন। অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ-সহ বহু সাধুসন্ত।

সমাজের জন্য, দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য যা বলার প্রয়োজন, আজ তা বলার সময় এসেছে। আমাদের সাধু-সন্ত-মহাত্মারা সমাজের চৈতন্য জাগরণের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমাদেরও তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী হতে হবে। তাঁদের দেখানো পথে আমাদেরও দেশ-ধর্ম-সমাজের প্রয়োজনে সত্যকে অবলম্বন করে ধর্মরক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

গত বছর ২৩ ডিসেম্বর, কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে ব্রিটিশ রাজশক্তির দম্ভ ভাঙতে ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা নিক্ষেপের ১১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মহানায়ক রাসবিহারী বসু এবং অগ্নিপুত্র বসন্ত বিশ্বাস-সহ বিপ্লবীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন সুখবর ও কর্মসংস্থান পত্রিকার সম্পাদক শমীকস্বপন ঘোষ। তিনি বলেন, কলকাতা হতে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষ্যে ১৯১২ সালে ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে ইংরেজ প্রশাসনের তরফে আয়োজিত হয় একটি রাজকীয় শোভাযাত্রা। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকরা বিশ্বকে বার্তা দিতে চেয়েছিল যে তাদের শাসনে ভারতবাসী ক্ষুব্ধ নয়। ভারতীয় জনতার সমর্থন তাদের সঙ্গে রয়েছে। ভারতজুড়ে তাদের অবাধ শোষণ, ভারতীয়দের ওপর তাদের অকথ্য নির্যাতনের ঘটনাবলী চাপা দিতে এই কৌশল অবলম্বন করে ইংরেজ প্রশাসন। এই শোভাযাত্রায় তৎকালীন ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। বড়লাটকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস বোমাটি নিক্ষেপ করে বড়লাট হার্ডিঞ্জকে গুরুতর আহত করেন। ১৯১৫ সালের ১০ মে (মতান্তরে ১১ মে) পঞ্জাবের আম্বালা জেলে মাত্র ২০ বছর বয়সে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী, বর্তমানে ১০৭ বছর বয়সি কর্নেল হরেন বিশ্বাস বাগচী, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নাতি পার্থসারথি বসু, 'শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'-র সম্পাদক তথা বসন্ত বিশ্বাসের নাতি তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সুদীপ বিশ্বাস ও সুতপা বিশ্বাস, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক তিমির রঞ্জন হালদার, 'রাসবিহারী বসু রিসার্চ ব্যুরো'র সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, শোভাবাজার প্রতিবিম্ব থিয়েটার গ্রুপের বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা স্মৃতি রক্ষা কমিটি'র সুবীর সাহা এবং জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। সুবীরবাবু অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের হাতে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের ছবি সংবলিত ২০২৫ সালের একটি সুন্দর ক্যালেন্ডার উপহার দেন। এদিন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের দাদু নীলবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক দিগম্বর বিশ্বাসের দৌহিত্র বসন্ত সরকারের নাতি অমিতাভ সরকার বসন্ত বিশ্বাসের ওপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতামহ কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর ১৪ বছর আন্দামানের সেলুলার জেলে কাটানোর কাহিনি বর্ণনা করেন। সংগীত পরিবেশন করেন চন্দ্রাণী কর্মকার। 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হলো বলিদান' গানটি সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এর সম্পাদক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী।

ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ১৫ ডিসেম্বর ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী, বেলেঘাটার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মানিকতলাস্থিত কল্যাণ ভবন প্রাঙ্গণে সকাল ১০ টায় ভগিনী নিবেদিতার ছবিতে মাল্যার্পণ ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শিবিরের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল এবং সংস্থার সচিব অজয় দাসগুপ্ত। ২ জন মহিলা-সহ মোট ২৩ জন রক্তদান করেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্মেলনে পূর্বতন কার্যকর্তা মিলন

গত বছরের ১৯ থেকে ২১ ডিসেম্বর কলকাতা-স্থিত বিনানী ধর্মশালায় আয়োজিত হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর ৪২-তম রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে গত ২০ ডিসেম্বর সম্মেলনস্থলে অনুষ্ঠিত হয়— 'শিক্ষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পূর্বতন কার্যকর্তা মিলন'। বিভিন্ন খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক ও আধিকারিকদের সঙ্গে এই মিলনে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা অমিতাভ চক্রবর্তী, রবিরঞ্জন সেন, অনুপ সাহা, অজিত দাস, অভিজিৎ দাস, প্রত্যূষ মণ্ডল, প্রণয় রায়, ললিত তোদি, পবন কুমার, কানাই ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু বক্সি, কিশোর কর, সুব্রত মণ্ডল, সপ্তর্ষি চৌধুরী, অর্ণব কুমার নাগ, অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, মৃন্ময় রায়, সুমন দাস, সর্বজিত রায় প্রমুখ। এই মিলনে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি ছাড়াও এই মিলনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মহানগরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সঙ্ঘের প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরা, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ ড. পঙ্কজ রায়, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক অপাংশুশেখর শীল এবং বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা মহানগর সম্পাদক দেবাঞ্জন পাল। মিলনে পারস্পরিক পরিচয় পর্বের মাধ্যমে পরিষদের পূর্ব কার্যকর্তাদের সঙ্গে নবীন কার্যকর্তাদের পরিচিতি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা অভিজিৎ বিশ্বাস।

মালদহের গাজোলে পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবির

গত বছর ২৩ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযান, মালদহ জেলার পক্ষ থেকে ৩ দিনের পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ বর্গ শুরু হয় মালদহের গাজোল সরস্বতী শিশুমন্দিরে। একজন তপশিলি শ্রেণীর শিক্ষার্থী-সহ ১৩ জন এই বর্গে পুরো সময় অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃত বিশারদ আচার্য কমলাকান্ত এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত পুরোহিত শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় বর্গে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন। বর্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সামাজিক সমরসতা অভিযানের কলকাতা ক্ষেত্র প্রমুখ গৌতম কুমার সরকার বলেন, সমাজ সংস্কারের জন্য শাস্ত্রসম্মত পূজাপাঠ, যাগযজ্ঞ সঠিক মন্ত্রোচ্চারণ-সহ হওয়া উচিত, যার খুবই অভাব। সেজন্য এই প্রশিক্ষণ বর্গের অয়োজন। বর্গ চলাকালীন অনেক কার্যকর্তা বর্গের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী, পূর্বক্ষেত্র কার্যকারিণী সদস্য গোবিন্দ ঘোষ। গত ২৫ ডিসেম্বর বর্গ সমাপন এবং তুলসী পূজন দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় সমরসতা যজ্ঞ। স্থানীয় অনেক নাগরিক এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন এবং সকলেই যজ্ঞে আহুতি দান করেন।

একল অভিযান
A PEOPLE'S MOVEMENT
দেশের কোটি কোটি বনবাসী ও গ্রামবাসী বন্ধুদের উন্নয়নের মুখ্য ধারায় শামিল করার লক্ষ্যে
এবং সনাতন সংস্কৃতির চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে
ত্রি-দিবসীয়
শ্রী কৃষ্ণ লীলা
১০৮ গীতা পাঠসহ
২ থেকে ৪ জানুয়ারি, ২০২৫
দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
৪ জানুয়ারি, ২০২৫
দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত
ওজস ব্যাংক্যুইট হল
৮৬-এ, জে বি এস, হাল্ডেন এভিনিউ, তৃতীয় তল
তোপসিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
পরমপূজ্য সদ্‌গুরু
ঋতেশ্বরজী মহারাজ (বৃন্দাবন ধাম)
আয়োজক
একল শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি
কলকাতা
Friends of Tribals Society

কল্পতরু : কথা ও কাহিনি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

পার্বতীর ইচ্ছাপূরণ

মন ভালো নেই পার্বতীর। কিছুদিন ধরেই। শীতের দিনে অনিকেত জবুথবু মানুষের মতোই সব শক্তি, উৎসাহ যেন উধাও হয়ে গেছে একবারে কর্পূরের মতো। আনন্দধাম কৈলাস এখন যেন অন্ধকার নিরানন্দপুরী। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে কেন এমন হচ্ছে! একী তাঁর চাওয়ারই এক উলট-পালট ফল!

হ্যাঁ, তিনি নির্জনতা চেয়েছিলেন। আপন মনে আপন ভাবে একটু ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তো সকলকে বাদ দিয়ে নয়! সব কিছুর মধ্যে থেকেই হতে চেয়েছিলেন নির্জনদ্বীপবাসিনী— একটু আত্মানুসন্ধানের জন্য। সেই চাওয়াটা যে তাঁকে নিঃসঙ্গ করে দেবে এটা তো কল্পনাতেও ছিল না তাঁর। নির্জনতার অর্থ তো নিঃসঙ্গতা নয়। নিঃসঙ্গতা যে শুষে নেয় জীবনের সবটুকু উত্তাপ— হয়তো এটা তাঁর মাথায় আসেনি একটু নির্জনতা চাওয়ার মুহূর্তে।

আজ তাঁর চাওয়া নির্জনতাই যেন গিলে খেতে চাইছে তাঁকে। ঈশান কোণ থেকে ধেয়ে আসা কালো মেঘের আড়ালে থাকা নীল আকাশের মতোই তাঁর আপন সত্তাকে হারিয়ে ফেলছেন তিনি। আর তাতেই একটা তীব্র ভালো-না-থাকার আস্বাদে পার্বতী আজ যেন বিষাদ প্রতিমা।

ভাবছেন পার্বতী। এমনটাই তো হওয়ার কথা। কার্তিক-গণেশ— দুই ছেলে তাঁর সাবালক হয়েছেন। এসময় তো তাদের ঘরবন্দি থাকার কথা নয়। নয় বলেই তারা এখন রয়েছে অন্যত্র— নিজের নিজের কাছে। দুই মেয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী— তারাও তো এখন স্বামীর ঘরে। আর স্বামী ভোলানাথ তো সব সময়েই থাকেন তুরীয়ানন্দে— ধ্যানমগ্ন। এখন একলা তিনি কী করবেন!

নিঃসঙ্গতা বা একলা থাকার কষ্টটা যেন হাড়ে হাড়ে টের পান পার্বতী। তাই তিনি যান পতিদেবতা মহেশ্বরেরই কাছে। ধ্যান ভাঙিয়ে বলেন, ভালো লাগছে না আমার। একদম ভালো লাগছে না!

—কেন?

—সব যেন ফাঁকা-ফাঁকা। কেউ নেই। এরকম একলা একলা থাকা যায়!

—কেন, তুমিই চেয়েছিলে নির্জনতা।

—কিন্তু এমন নিঃসঙ্গতা তো চাইনি।

—তাহলে?

—জানি না। যা হোক একটা কিছু করো তুমি।

একটু চুপ করে থেকে শিব বলেন, চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি। ভালো লাগবে তোমার।

পার্বতীকে নিয়ে শিব আসেন অমরার নন্দনকাননে। চারিদিকে সবুজ। কত না গাছ। কত ফুল—কত ফল।

দেখতে দেখতে তরতাজা পার্বতী। আবার যেন কিশোরী-বেলায় ফেরা। ঘুরতে ঘুরতে আসেন একটি গাছের নীচে। নন্দনকাননের মাঝখানটায় মেরু পাহাড়ের মাথায় বেড়ে ওঠা গাছটা দাঁড়িয়ে আছে সব গাছ ছাড়িয়ে। কী সবুজ। কীরকম একটা সুবাস ছড়াচ্ছে চারিদিকে। এমন গাছ কোনোদিন দেখেননি পার্বতী। তাই সবিস্ময় জিজ্ঞাসা— কী গাছ এটি?

শিব বলেন, কল্পতরু এই গাছের নাম। যা চাইবে তাই পাবে তুমি। সব চাওয়া— সব আশা পূরণ করে এই গাছ।

—সত্যি—সত্যি বলছো তুমি?

—কথা কী কাজ! পরীক্ষা করেই দেখো না! শিবের কথায় ধ্যানমগ্না পার্বতী। সেই মুহূর্তে তিনি চান তাঁর মন ভালো করার ওষুধ। চান একটি কন্যা— যে হবে অপরূপা— ন'টি দিব্যগুণের আধার। শান্তি,শুদ্ধতা, জ্ঞান, শক্তি, ধৈর্য, সম্মান, সমৃদ্ধি, সাফল্যও সর্ব সুখের প্রতিরূপ!

পার্বতীর সেই চাওয়ার সঙ্গে শিবের নিঃশ্বাসের মিলন ঘটতেই কল্পতরু থেকে বেরিয়ে আসে এক কন্যা। তুষার ধবলা গোলাপ-বসনা সেই কন্যার সোনালি কেশগুচ্ছের ওপরে রয়েছে এক কুসুম কিরীট। পাকা বেদানার দানার মতো গোলাপি তার পাতলা দুটি ঠোঁট। জীবনের উল্লাসে ভরা তার চোখে-মুখে যেন সূর্যের দীপ্তি। তার পায়ের নূপুরে ধ্বনিত সংগীতের নানা রাগ-রাগিনী।

সে কন্যাকে পেয়ে মুগ্ধ পার্বতী তাকান শিবের দিকে। তিনি হেসে বলেন, কী দেখছো— এ হলো তোমারই প্রতিরূপ। তোমার মধ্যে রয়েছে যে ন'টি রূপ— তোমার চাওয়া পূরণ করতে কল্পতরু তোমাকে দিয়েছে তারই সমাহার এই কন্যা। গ্রহণ করো একে। এই দূর করবে তোমার সঙ্গহীনতার সব শূন্যতা, সব বেদনা। এই তোমাকে দেবে জীবনের নানা রূপ ও রসের সন্ধান। তোমার সব শোকহরা এই অশোকসুন্দরীর নাম দিলাম অরণ্যানী। কী পছন্দ হয়েছে নাম?

শিবের কথার সমর্থনেই পার্বতী আজ স্নিগ্ধ কণ্ঠে আবৃত্তি করে বলেছেন বেদের অরণ্যানী সূক্ত। বলেন, তুমি সব অরণ্য ও অরণ্যবাসীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি বনদেবী। তুমি দৃশ্যমান হলেও অদৃশ্য, অধরা। তোমার সৌরভে সুরভিত চারিদিক। তুমি কর্ষণ না করেও অফুরন্ত খাদ্যের ভাণ্ডারী। ওই অর্থে তুমি অন্নদাত্রী— অন্নপূর্ণা।

সেদিন ওই মুহূর্ত থেকেই পার্বতী পূর্ণানন্দময়ী— বরদা— সর্ব শুভংকরী। সেদিন ত্রিদশাধিপতির ওই সর্বকল্যাণকর— মনোহারী নন্দনকাননের সেই কল্পতরুমূলে দাঁড়িয়ে পার্বতী হঠাৎই হলেন জিজ্ঞাসু। পঞ্চাননকে তাঁর প্রশ্ন, আচ্ছা— এই যে শুভময়ী কল্পতরু— কোথা থেকে, কেমন করে হলো এর উদ্ভব? ইন্দ্রই-বা কেমন করে হলেন এই বৃক্ষের অধিকারী।

সমুদ্র মন্থনে কল্পতরু

মুখর পঞ্চানন। পঞ্চমুখে বর্ণনা করতে থাকেন কল্পতরুর আবির্ভাব কাহিনি। বলেন, সে এক কল্পান্তরের কথা। অসুরদের সঙ্গে সংঘর্ষে দেবতারা হলেন পরাজিত। বিতাড়িত হলেন স্বর্গপুরী থেকে।

স্বর্গচ্যুত দেবতারা বাস্তুহারার মতোই ভ্রাম্যমাণ। একটু আশ্রয় এবং অসুরদের অসূয়া থেকে মুক্ত হবার উপায় বের করতে ব্যর্থ দেবতারা একসময় যান বিষ্ণুর কাছে। কাতর নিবেদন তাঁদের, যে কোনো একটা উপায়ের কথা বলুন! কীভাবে আমাদের এই দুর্দশা দূর হবে তার একটা পথ বলে দিন। কৃপা করুন আমাদের।

সবই জানতেন বিষ্ণু। তাই গম্ভীরভাবে বলেন, অসুররা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের জন্যই এখন এমন অজেয়। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে অসুরগুরু শুক্রাচার্য নিহতদের বাঁচিয়ে তুললেন। সে কারণেই সংখ্যায় তারা দেবতাদের ছাপিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যাশক্তিই তখন অসুরদের সবচেয়ে বড়ো বল ও ভরসা।

বিষ্ণুর এ কথায় সমবেত দেবতাদের কণ্ঠে এক আর্তধ্বনি— তাহলে— তাহলে কি ঘোর অন্ধকার রাতের হবে না অবসান! উঠবে না কি আর কোনোদিন দেবতাদের সৌভাগ্যরবি?

বিষ্ণু নিশ্চুপ। ক্ষণকালের জন্য। তারপর শান্তস্বরেই বলেন, উপায় একটা আছে। অমৃত-সন্ধানী হতে হবে দেবতাদের। একমাত্র অমৃতই দেবতাদের করে তুলবে মরণজয়ী। তারাও তখন সংখ্যায় হয়ে উঠবে অসুরদের সমতুল।

কীভাবে— কেমন করে পাওয়া যাবে ওই অমৃত? আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন সেই মুহূর্তে সর্বহারা দেবতার দল।

বিষ্ণু বলেন, অমৃত পাওয়া যাবে সমুদ্র মন্থনের মধ্য দিয়ে। ক্ষীরোদ সাগরকে মন্থন করলেই উঠে আসবে অমৃত। কিন্তু সে মন্থন বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। দেবতাদের একার শক্তিতে সমুদ্র মন্থন সম্ভব নয় কোনোমতেই।

—তা হলে?

—চাই ঐক্য। সুরাসুর একসঙ্গে— এক মনে যদি সমুদ্রমন্থন করে তাহলেই পাওয়া যাবে অমৃত।

বিষ্ণুর সে কথায় দেবতারা বলেন, তাহলে তো অসুরদেরও দিতে হবে অমৃতের ভাগ। তাহলে তো সেই অসাম্যই থেকে যাবে। দেবতাদের তো কোনো লাভই হবে না তাহলে!

দেবতাদের উদ্বেগ দেখে হাসেন বিষ্ণু। বলেন, ভয় নেই, অসুররা যাতে অমৃত না পায় তার ব্যবস্থা করবো আমি। তোমরা আপাতত অসুরদের সঙ্গে জোট বেঁধে সমুদ্রমন্থন করো। সেই মন্থনেই লাভ হবে অভীষ্ট। আবার পাবে তোমরা স্বর্গের অধিকার।

বিষ্ণুর কথামতোই কাজ করেন দেবতারা। অসুররাও অমৃতের আশায় জোট বাঁধে। শুরু হয় সমুদ্রমন্থন। মন্থনদণ্ড হয় মন্দার পর্বত। শেষনাগকে করা হয় মন্থনরজ্জু। সেই মন্থনে প্রথমেই ওই ক্ষীরোদ সমুদ্র থেকে উঠে আসে কামধেনু আর কল্পতরু— পারিজাত— যা চাওয়া মাত্রই পূরণ করে সব বাসনা।

এই যে কামধেনু আর পারিজাত— তার মূল্যটা ঠিক বুঝতে পারে না অসুররা। অথবা অমৃতের মোহে এসব তাদের মনে হয় নেহাতই তুচ্ছ। সে কারণেই ইন্দ্র ওই দুটি বস্তুই চাইলে হেলাভরেই অসুররা দিয়ে দেয় তা। ইন্দ্রও সেই ইচ্ছেপূরণ গাছকে রোপণ করেন স্বর্গে তাঁর নন্দনকাননে। এই শক্তি ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে ইন্দ্র ছিলেন খুবই সচেতন। কেউ যাতে ওই বৃক্ষকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে না পারে— তার জন্য বসান কড়া পাহারা। দেবরাজ ইন্দ্রের অত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন কল্পতরু পারিজাত হলো স্বর্গছাড়া। বলা যায় অবস্থার ফেরে ইন্দ্র নিজেই সেই গাছ শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। পারিজাতকে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে আসেন দ্বারকায়। সেই থেকে ওই গাছ হয় মর্ত্যলোকবাসী।

মর্ত্যে এল কল্পতরু

সেটা দ্বাপর যুগের কথা। হইহই ইন্দ্রপুরে। খোয়া গিয়েছে দেবমাতা অদিতির কানের কুণ্ডল। চুরি করেছে প্রাগজ্যোতিষ-

পুরের অধিপতি নরকাসুর। খবরটা শুনেই ক্ষিপ্ত দেবরাজ ইন্দ্র। সদলবলে যান নরকাসুরের কাছ থেকে অপহৃত কুণ্ডল ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু যুদ্ধে হলো নিদারুণ পরাজয়। কুণ্ডল উদ্ধার তো হলই না, উলটে ঐরাবতটিও ছিনিয়ে নিতে চায় নরকাসুর।

অসহায় ইন্দ্র এবার কেঁদে পড়েন দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বলেন, উদ্ধার করুন। মান তো আর থাকে না। ইন্দ্রকে অভয় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যান যুদ্ধে। সঙ্গে অন্যতম মহিষী সত্যভামা। ভয়ানক সে যুদ্ধে সত্যভামার হাতেই নিহত হয় অসুর নরক। উদ্ধার হয় মাতা অদিতির কুণ্ডল। মুক্ত হয় নরক-কারাগারে বন্দি ষোলোশো রাজনন্দিনী।

সত্যভামার হাতে প্রায় নরকের নিধনের পেছনে রয়েছে একটি কারণ। নরক বর পেয়েছিল তার মৃত্যু হবে মা ভূদেবীর হাতে। সত্যভামা ছিলেন ভূদেবীর অবতার। তাই তাঁরই হাতে নরকাসুরের বধ ছিল পূর্বনির্ধারিত।

মা অদিতির কুণ্ডল ফিরে পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ভারি খুশি। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে আমন্ত্রণ করেন তাঁর অমরাপুরীতে। তাঁরা এলে ইন্দ্রদেব রাজকীয় অভ্যর্থনা জানান তাঁদের। ব্যাপারটা কিন্তু ভালো লাগে না দেবরাজমহিষী শচীর। দেবপুরের সম্রাজ্ঞী তিনি। তিনি কখনোই মর্ত্যমানবী সত্যভামাকে রাজকীয় সম্মান জানাবেন না। রূপ ও ঐশ্বর্যের অহংকারে শচীদেবী কিছুটা উপেক্ষাই করেন সত্যভামাকে। তাঁর এই অহমিকা ও উপেক্ষা নজর এড়ায় না সত্যভামার। রাজা সত্রাজিতের কন্যা তিনি। দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণ তাঁর স্বামী। রণপণ্ডিতানি তিনি। তাঁরই হাতে নিহত নরকাসুর। আর তাঁকেই কিনা অবজ্ঞা! প্রতিশোধের পথ খোঁজেন সত্যভামা। আর সে পথ পেয়ে যান নন্দনকাননে গিয়ে। ইচ্ছাপূরণকারী কল্পতরু পারিজাত বৃক্ষটি তিনি নিয়ে যেতে চান।

মহিষীর বাসনা পূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তুলে নেন পারিজাত বৃক্ষ। শচীর প্ররোচনায় ইন্দ্র এবার বাধা দেন শ্রীকৃষ্ণকে। শুরু হয় যুদ্ধ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপর্যস্ত ইন্দ্র পালিয়ে যান রণস্থল ছেড়ে।

তাঁকে পালাতে দেখে সত্যভামাই বলেন, এভাবে পালাবেন না। এতে যে দেবতাদের কলঙ্ক হবে। সেটা আমি চাই না। তাছাড়া, এই পারিজাত বৃক্ষের প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। আমি কেবল দেবরানি শচীর অহংকার চূর্ণ করার জন্যই এটি নিয়েছিলাম। এখন নিন আপনাদের কল্পবৃক্ষ।

হতমান ইন্দ্র। শচীরও নেই আর সে দেমাক। বরং এক ধরনের লজ্জায় নতমস্তক তিনি। বলেন, না-না ভুল হয়েছে আমারই। এই বৃক্ষ নিয়ে যান আপনি মর্ত্যে। এ আমাদের অতি সামান্য উপহার।

দেবরাজ ইন্দ্রও অনুনয় জানান একইভাবে। কাজেই কিছুটা বাধ্য হয়েই কৃষ্ণ-সত্যভামা সে গাছ নিয়ে আসেন দ্বারকায়। আর তখন থেকেই কল্পবৃক্ষ এই পৃথিবীরই সম্পদ।

শিবই কল্পতরু

দেবলোকের কল্পতরু এল মর্ত্যে। এল কত না নামে। কেউ বলেন, কল্পপাদপ, কেউ বলেন কল্পদ্রুম, কেউ-বা কল্পবৃক্ষ অথবা ইচ্ছাপূরণ গাছ। আবার কোথাও এই বৃক্ষের পরিচিতি বয়োবৃক্ষ রূপে। শুধু কি বৃক্ষ, কল্পলতা বা কল্পলতিকাও একইভাবে মানুষের করে বাসনা পূরণ। কোথাও-বা বলা হয়েছে একে রত্নবৃক্ষ। স্মৃতিকার হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গ চিন্তামণি'তে এই বৃক্ষর স্বরূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'এই বৃক্ষ হলো স্বর্ণ ও রজতময়ী। কালিদাসও তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে এই বৃক্ষের কথায় লিখেছেন, যক্ষের উদ্যান সুশোভিত কল্পবৃক্ষ আর কল্পলতিকায়।

আবার শিবপুরাণে বৃক্ষ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে স্বয়ং শিবকে। দক্ষযজ্ঞ শেষে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর নিজের আগের কাজের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলেছেন— 'আজ বুঝলাম সেই সত্য সারকথা। বুঝলাম এই বিশ্বের মহাশক্তি— শিব— যাঁকে বোঝা যায় কেবল বেদের মাধ্যমে। বুঝলাম, শিবই-কল্পবৃক্ষ— জগৎ কল্যাণে বৃক্ষরূপে তাঁর আবির্ভাব। বুঝলাম, তুমিই দুষ্কৃতীকে দাও শাস্তি, মঙ্গল করো সকলের।'

প্রজাপতি দক্ষের এই স্তুতি থেকে বোঝা যায় শিব তথা ঈশ্বর জগতের কল্যাণের জন্যই আবির্ভূত হন কল্পতরু রূপে এই মানব সংসারে। একবার নয়, আসেন তিনি কল্পে কল্পে, যুগে যুগে যুগবতার রূপে।

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

আবর্তনের এই ধারাক্রমেই এলো ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। এলো এক মহাপুণ্য দিবস রূপে। সেদিন এই দিনটির মাহাত্ম্য ঘোষিত হলো যেভাবে তার পূর্বাভাস ছিল না কারও কাছে। অথবা, এই দিনটি যেন আত্মগোপন করে ছিল এক মহাসাধকের অন্তরের এক গহীন কোণে। তিনি জানতেন। হয়তো এ অনুভব ছিল তাঁর অথবা তাঁর মানস সন্তানদেরও। একদা যাঁর স্পর্শে যাঁদের ঘটেছিল এক মহৎ দর্শন— চৈতন্যর মহাদ্বার হয়েছিল উন্মুক্ত, তাঁরা পেয়েছিলেন ইঙ্গিত। আপন সাধনায় যে উপলব্ধি ঘটেছিল তাঁদের, তা উদ্বোধিত হোক আরও অজস্র ভক্ত-হৃদয়ে, এ গোপন প্রার্থনা গুঞ্জরিত হচ্ছিল অন্তরলোকে তাঁদের— একান্ত সঙ্গোপনে। তাঁরাও হয়তো এটাই চাইছিলেন— কিন্তু সবই ছিল অব্যক্ত।

অবশেষে এল তা ব্যক্ত হবার মাহেন্দ্রক্ষণ। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তখন নিদারুণ গলরোগে আক্রান্ত। সময়টা ১৮৮৫। দক্ষিণেশ্বরে শুরু হয়েছে চিকিৎসা। কিন্তু কোনো ফলই হচ্ছে না। চিকিৎসকরা বললেন, জায়গা বদল করতে হবে। কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হোক তাঁকে। তাতে চিকিৎসারও হবে অনেক সুবিধা।

সেই সিদ্ধান্ত মতোই দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁকে আনা হলো কলকাতায়। ১৮৩৬-এ যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন হুগলি জেলার কামারপুকুরে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনার দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছিল যাঁর সাধন সুরধনী, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মহানিষ্ক্রমণ হলো সেখান থেকে ১৮৮৫-এর সেপ্টেম্বরের শেষে।

প্রথমে বাগবাজারে, তারপর ২ অক্টোবর শ্যামপুকুরে। ১৮৮৫-এর ৬ নভেম্বর কালীপূজার রাতে এই বাড়িতেই গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ভক্তশিষ্য তাঁরই দেহে করেন কালীর অর্চনা। রোগজীর্ণ দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ ওঠে দাঁড়ালেন। হুবহু মা কালীর মতো

ভঙ্গিমা। বর এবং অভয় মুদ্রায় ভাববিভোর তখন তিনি। ভক্ত মননে এটা হলো তাঁর 'বরাভয়লীলা'।

অভয় দিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর শরীর নিয়ে ভয় গেল না ভক্তদের। তাঁকে আরও একটু স্বাচ্ছন্দ্য— আরও একটু খোলা হাওয়া বাতাসে রাখার জন্যই ১১ ডিসেম্বর তাঁকে আনা হলো কাশীপুরে গোপাললাল ঘোষের ১১ বিঘা আয়তনের এক বাগানবাড়িতে। এটাই হলো তাঁর লীলাবসানের মহাতীর্থভূমি— কাশীপুর উদ্যানবাটী।

একইসঙ্গে নানা মতে চিকিৎসা চলছে শ্রীরামকৃষ্ণের, কিন্তু উন্নতির কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। পুরো অবস্থাটাই তাঁর তখন শরতের সূচনার মতো। কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি। শেষ হলো ১৮৮৫-র ডিসেম্বর মাসেও। সেদিন ইংরেজির নববর্ষ। ১ জানুয়ারি। সেদিনের সকালটা যেন বিশেষভাবেই সেজে উঠেছিল। রোদ ঝলমলে আকাশ। শীতও যেন একটু কম। সেদিন কাশীপুরের বাগানবাড়িতে সকলেরই মন যেন ফুল্লবিকশিত। কীরকম একটা ভালো লাগার ওম ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো। তাঁর সেই ভালো থাকাটাই ভক্তদের করে তুলেছে অনেকটাই উজ্জীবিত উদ্দীপিত।

১ জানুয়ারি ছুটির দিন। সকাল থেকেই বসে এসেছেন বেশ কিছু ভক্ত। যাঁরা উদ্যানবাটিতেই থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা শুশ্রূষা করার জন্য তাঁদের নিয়ে জনা ত্রিশ ভক্ত ছিলেন সেদিন ওই বাগানবাড়িতে। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দুপুরে সামান্য হলেও কিছুটা খাবার খেয়েছেন, তাই ভক্তরা আরও খুশি। তাঁদের মনে আশার ঝিলিক, এবার বোধহয় সুস্থ হবেন তাঁদের ঠাকুর। আর ওই ভাবনায় ভাবিত বেশ কয়েকজন ভক্ত বাগানে রোদ পোহাচ্ছেন। কথাবার্তা যা বলছেন— তার সবই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে। তিনি যে অবতারপুরুষ— মানবকল্যাণে যে তাঁর আবির্ভাব, এসব নিয়েই চলছে নানা কথা।

ওদিকে দোতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎই বললেন, এবার তিনি একটু বেড়াবেন ওই বাগানে। বেলা তখন প্রায় তিনটে। সূর্য অস্ত যাওয়ার তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। তাই সেবকরা তাঁর সে ইচ্ছায় বাদ সাধলেন না। বরং তাঁরই কথামতো সাজিয়ে দিলেন লালপেড়ে ধুতি, কালো পিরান, চাদর, কানঢাকা টুপিতে। দোতলা থেকে নীচে নামা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন লাটু আর রামলাল। একতলার ঘর পেরিয়ে বাগানের পথে হাঁটা দিতেন তিনি। বাগানে অন্যান্যদের দেখে লাটু আবার ওপরেই চলে গেলেন।

বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণকে আসতে দেখেই ভক্তরা উঠে দাঁড়ান। প্রায় ছুটে আসেন ভক্তরা। প্রণত হন তাঁরা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কেমন যেন বিমনা। তিনি দেখছেন সকলকে। তারপর হঠাৎই গিরীশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, তুমি যে চারিদিকে আমাকে অবতার বলে প্রচার করছো, তা কী দেখেছো তুমি আমার মধ্যে?

সে প্রশ্নে গিরীশচন্দ্রও যেন ভাব-বিভোর। গদগদ স্বরে বলতে থাকেন, আপনি অবতার— ঈশ্বরের অবতার। নবরূপধারী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। আমার মতো পাপীতাপীদের মুক্তির জন্য নেমে এসেছেন এই ধরাধামে। একথায় শ্রীরামকৃষ্ণও গাঢ় কণ্ঠে বলেন, এ আর তোমাদের কী বলবো! তোমাদের চৈতন্য হোক।

কথাগুলি বলতে বলতে সমাধিস্থ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই অবস্থাতেই গিরীশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত-সহ ভক্তদের স্পর্শ করতে থাকেন। কণ্ঠে স্ফুরিত মাত্র তিনটি শব্দ,— 'তোমাদের চৈতন্য হোক!' চৈতন্য জাগানোর ফেরিওয়ালা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে সেদিন কাশীপুর বাগানবাড়িতে যেন বসল ভাবোন্মাদদের মেলা। উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হতে থাকে,— জয় শ্রীরামকৃষ্ণের জয়। সঙ্গে আহ্বান,— ওরে কে কোথায় আছিস, আয়, ঠাকুর আজ আমাদের কল্পতরু হয়েছেন— যার যা চাওয়ার চেয়ে নে।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে ভক্তপ্রাণে উঠেছিল ভাবের এক বিচিত্র তরঙ্গ। তাঁরা পেয়েছিলেন জীবনের অরূপরতন। একথা বলেছিলেন তাঁরা নিজেরাই কথায়-কথায়। সেদিন তাঁর কৃপাপাত্রদের মধ্যে কিন্তু ছিলেন কেবল তাঁর গৃহী ভক্তরাই। তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী সন্তানরা কিন্তু কেউ আসেননি সেদিন উদ্যানের ওই ভাবের মেলায়।

কল্পতরু উৎসব কথা

আপন চৈতন্যর আলোয় উদ্ভাসিত রামচন্দ্র দত্ত পরে ১ জানুয়ারিকে চিহ্নিত করেন 'কল্পতরু দিবস' হিসেবে। বলেন, ঠাকুর যে সেদিন মেতেছিলেন এক অনন্য লীলায়। সেদিন তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন। সেটাই মনে রাখা দরকার বছরের পর বছর— এই দিনটিতে।

রামচন্দ্র দত্তর কথাই মান্যতা পায়— সামান্য একটু বদলের মধ্য দিয়ে। কল্পতরু দিবসে হয় কল্পতরু উৎসব। সে উৎসব আজ বাঙ্গালির ধ্যানের উৎসব— প্রাণের উৎসব। সেটা হয়েছে ঐশী ইচ্ছাতেই।

ঈশ্বর শুভংকর। জীবজগতের শুভের জন্য তিনি সতত তৎপর। আর সে কারণে সমস্ত জীবের জন্য তিনি স্বয়ং হয়েছেন কল্পতরু। প্রাণীর মঙ্গলের জন্যই এমন কিছু বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ জগতে সেগুলি আজও সুমহান। জীবের সবরকম প্রয়োজন মেটাবার জন্যই ওইসব বৃক্ষের উদ্ভব। এই মরলোকে সেগুলি কল্পবৃক্ষ নামেই খ্যাত। ওইসব কল্পতরুর মধ্যে আছে নারকেল, অশ্বত্থ, বটের মতো কয়েকটি গাছ। এগুলি সব সময়েই প্রাণীকুলকে দেয় খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় এবং আরও অনেক কিছু। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও কল্পবৃক্ষ হয়ে আবির্ভূত হন যুগে যুগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই যুগাবতার। মানবকল্যাণে তাদের সব কামনা-বাসনা পূরণের জন্য তাঁর কল্পতরু লীলার প্রকাশ। কল্পতরু হয়েও মানুষকে সুপথগামী করার জন্যই বারবার ভক্তসঙ্গমে বলেছেন, কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। তাই কিছু চাওয়ার আগে সাধন ভজনের মাধ্যমে হতে হয় শুদ্ধচিত্ত। তাই তো সেই প্রায় হলুদরাঙা অপরাহ্নে তাঁর বরদান বা প্রত্যাশা— 'চৈতন্য হোক'। সকলের মধ্যে চৈতন্যর উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। কল্পতরু দিবসের পুণ্যলগ্নে সে কথাটাই স্মরণে রাখা দরকার সকলের। যে চৈতন্য জাগরণের কথা বলেছিলেন তিনি তার সাধনা করে কেবল পার্থিব চাহিদা পূরণের কথা বললে কিন্তু হিতে বিপরীতও হতে পারে।

না-মানুষ, না-প্রাণের নিরন্তর শক্তি চেতনার থেকে মানুষ পাক চৈতন্যের সন্ধান

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' পড়তে পড়তে পাই রাজধর্মের কথোপকথন। রাজা-মন্ত্রীর সংলাপ। মন্ত্রীমশাই রাজাকে সেদিন বলছিলেন— 'রাজকার্যে ছোটোদেরও অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে...।' এই জোট বাঁধার নামই ভিতরের উত্তেজনা, চৈতন্য বোধের জাগরণ। জীবনের তরঙ্গের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ও অবগত হওয়া। কেউ যখন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে ওঠে— রাজা তোর কাপড় কোথায়? তখন সবার অন্তত এটুকু চৈতন্য জাগে কি? মনে হয় কি এই প্রশ্ন ওই দূরের থেকে একজন কেন করল! সেই একজনটা, প্রথমজনটা, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থজনটা অন্য কেউ হোক এটাই চাই। অন্য কেউ হোক ভাবতে থাকলে সমাজ ও প্রশাসনের অনৈতিক স্পর্ধা বাড়ে। তখন চৈতন্য জাগাতে অনুষ্ঠান আয়োজন, জ্ঞান বিতরণ চলে। কেউ শুনতেই চায় না। মনুষ্যজাতির দোষ যে তারা প্রয়োজনের চাইতেও অনেক বেশি ষড়রিপুর ষড়যন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়।

তখন অন্যায়ের বিরুদ্ধতায় আলোড়ন চলে। কিন্তু তা ক্ষুদ্র সেতার তারের শব্দ। যে কথা 'অব্যক্ত'তে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উল্লেখ করেছিলেন— 'তার আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ থামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না...।' আমাদের সামাজিক পরিকাঠামোর মস্ত বিপর্যস্ততা এই ধ্বনি না শোনা। চৈতন্য উদয় তখনই হয় যখন নন-কমপ্লায়েন্সগুলো শব্দ তোলে, কানে পৌঁছায়। কর্ণকুহরের তা যে মাধ্যমেরই প্রতিবাদ হোক না কেন তা অশ্রুত বায়ু তরঙ্গের মতো। শক্তিতে আঘাত করছে কিন্তু বুদ্ধিতে নয়। ধ্বনির গভীরতা প্রাণীজগতে পেঁচা, বাদুড় ও আরও অনেকে পায়। প্রবল অন্ধকারেও লক্ষ শব্দের তরঙ্গে কত প্রাণী দেখতে পায়। অথচ এত যন্ত্র, বুদ্ধিমত্তার আয়োজনের পরেও মানুষের চৈতন্যবোধ ইন্দ্রিয়বোধকে উত্তীর্ণ করে বুদ্ধিবোধের তরঙ্গে আলোড়ন তৈরি করতে অক্ষম।

প্রকৃতিতে জাগরণের পরে নিদ্রা। আবার আপন নিয়মে শক্তি তরঙ্গের উপলব্ধিতে তা জেগে ওঠে। 'বৃক্ষ, মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল...' অথচ আমরা এত আধুনিক হয়েও এত যন্ত্র প্রযুক্তিকে ঘাড়ে করে বইছি কিন্তু একটা বৃক্ষ বীজের থেকে চেতনা সঞ্চার সঞ্চয়ে স্বীয় উপায় ইচ্ছে গড়ে তুলতে অপারগ। একটা পরমাণুও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিশ্ব পরিচয়ে রবি ঠাকুর উল্লেখ করছেন ভৌতবাদের। 'ইলেকট্রন বাইরে থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন দেয় এবং হঠাৎ কখন দেখা দেবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ করে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়। এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন তেজ বিকীর্ণ করে, কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবির্ভূত হয়। ছাড়া-পাওয়া এই তেজকেই আমরা পাই আলো রূপে।' কবিগুরুর ভাষায়— 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'। আমাদের আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় এই আলোর অনুসন্ধান চলছে। চলছে বলেই এই সংখ্যার অবতারণা। আলো কোথায়! সমাজ থেকে, প্রকৃতি থেকে অঞ্জলি ভরে একজন নিচ্ছে কিন্তু যে সময়ে তার সেই সম্পদ অন্ধকার ঘনালে ফেরানো উচিত, তা সে করছে কোথায়! সত্তার চৈতন্য

ফ ঃ ৫

বিশ্বে ঘটছে, তাই বিশ্ব চলছে, কিন্তু বোধের চৈতন্য তা পাঠ করতে পিছপা। নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে বোধের আলো হোমাগ্নিদীপ্তিতে আসে কই।

কিন্তু আমাদের 'সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হলো আকাশে কালের সীমানা আলোর বেড়া দিয়ে।' কালের সীমান্তে হাঁটতে হাঁটতে শাসন চৈতন্য যখন রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যক্তি লোভের করাল গহ্বরে আসে তখন গ্রহণ চলে। আমাদের গ্রহণ দশা বিদ্যমান। তাই চৈতন্যের উদয়ের আগেই ব্যক্তিস্বার্থ অনায়াসে বৃহত্তর প্রত্যাশার এমনকী অধিকারের আত্মসাতী আয়তন গড়ছে। আইনস্টাইনের থিয়োরিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিমত জ্ঞাপনে বলেছিলেন, 'পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতিক টান, বাইরের টানটা মহাকর্ষের; যেমন মানুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।' বস্তু জগতের থেকে এই বোধোদয় যদি হয় তবেই বাইরের টানটা তার ভিতরের টানকে অতিক্রম করে। তার নাম রাষ্ট্র চেতনা। চৈতন্য সেদিন থেকেই তৈরির প্রক্রিয়া শুরু যেদিন বস্তু থেকে এককোষী প্রাণী এবং এককোষী প্রাণীর থেকে ক্রম জটিল বিবর্তনের ধারায় হোমো সেপিয়েন্স তৈরি হলো। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতার বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। আমাদের সাধনা এটাই 'জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্য আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলছে...।'

আন্তর্জাতিক স্তরে যখন জেহাদি আগ্রাসন, ইসলামি দেশে গৃহযুদ্ধ, তারাই অশান্তিবোধের স্থূলাকার। আমাদের দেশের সেকুলারবাদীদের সে চৈতন্যটুকু নেই যে তারা বুঝবে দেশের মধ্যে বিরুদ্ধদলের শক্তি বলিষ্ঠ হতে চাইছে। রাষ্ট্রচেতনা কোনো রাজনৈতিক তামাশা নয়। তা আগে উল্লেখিত উদ্ভিদ বীজের মতো। ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করে। তাকে লালিত পালিত করতে হয়। তবেই তা মাটি ভেদ করে ওঠে। জেগে ওঠে পাথরের ভিতর থেকে। রাষ্ট্রপ্রাণবোধের চাইতে বড়ো চৈতন্য আর কিছুই হয় না। একটা বীজ থেকে ঠিক যে পদ্ধতিতে মহীরুহ হয়, জাতীয় বোধ চৈতন্যটাও তেমন। বিশ্বের 'শান্তি' নামক পদার্থটি ঠিক ভালোমানুষি নয় কিন্তু। আজ যারা দুরন্ত সর্বনেশে তারা মিলিত, তাই শান্তির চৈতন্য বিজ্ঞাপন প্রচারের এত প্রয়োজন। চৈতন্যবোধের প্রশ্ন তখন থেকেই বেশি করে উঠছে যখন থেকে Political ethics and Social contract theory তার পাকা জায়গা করেছে। আজ আমাদের চারদিকে তা কেবলমাত্রই জায়গা দখল নয়, সর্বোচ্চ আলোচনার চর্চার অবকাশ রাখে। Corruption-এর যথাযথ বাংলা কী হতে পারে? দুর্নীতি? আমিতো বলব— না। Corruption তখনই শুরু হয় যখন থেকে চৈতন্যের ঝিমুনি আসে। তার প্রয়োগ এবং বহুল বিপুল বদভ্যাসকে আমরা তখন Corruption নামক শব্দ বলে দায় এড়াতে চাই। 'Corruption is just another type of tyranny!' একটা ব্যবস্থায় যত Corruption সে ব্যবস্থা ততটাই অমানবিক ব্যধিগ্রস্ত জরায় ভরা। তখন উদ্ভিদকুল, ভৌতকুল যেখানে যত ছন্দ সৃষ্টি, চৈতন্য বোধের অতল সমুদ্র, তা স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষ চায়। শিক্ষক হয় না তারা।

আজ এই নিবন্ধের অবতারণা এইজন্যই কারণ আমাদের দুটি ব্যাধি ধরে বসছে। প্রথমটি দুর্নীতি, দ্বিতীয়টি রাজ্য ব্যবস্থা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক চক্রান্তে, শক্তিতে তুর্কি লক্ষ্মৌ টুপি। সেকুলারবাদও একরকম বৃহত্তর Corruption, যা জাতীয় কর্তৃত্বের আগ্রাসনে উদ্যত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যখন জরিপ করে তখন দেখি কত বড়ো শতাংশের মানুষ (৫০ শতাংশেরও বেশি) অনৈতিক অর্থ লেন-দেন করেই থাকে। অন্তত জীবনে একবার। ২০২৩, Corruption Perception Index (CPI)-তে ১৮০টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান ৯৩-এ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক লেন-দেন, বিনিয়োগ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে ভারতের অগ্রগতি নজরকাড়া।

তা হলে যে তা মানবিক, নৈতিক, ব্যক্তি ও সামাজিক চৈতন্যের বিনিয়োগে শ্রী আনবে এমন কোনো মাথার দিব্যি এবং সমানুপাতিক সংযোগ নেই। সর্বত্র অতি রাজনীতীকরণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির একনায়কতন্ত্র Corruption-কে crime-এর চাইতেও নীচু অথচ স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করছে। চৈতন্যের উদয় হচ্ছে না, তাই কোণে কোণে নজরবন্দি ক্যামেরা। যা সংকটের সমাধান সাময়িক হলেও আসলে চৈতন্যের ঘরে 'গৃহমধ্যে নিশ্চল বায়ু'। মানুষ আকাশ জয় করতে পারল কিন্তু প্রবাল কেমন করে ধীরে ধীরে সহিষ্ণু চেষ্টায় পাহাড় গঠন করে তা শিখতে পারল না। দেশ দেশান্তরে নিমেষে যোগাযোগ চলছে কিন্তু ভিতরের চালিকাশক্তিতে কতটা অকর্মণ্যতা জোট বেঁধেছে তা পরিমিত হয় না। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া তার আভ্যন্তরীণ প্রশ্নে নাড়া। আলোকবর্তী সে। বাইরের ধাক্কাতে সে প্রচণ্ড সাড়া দেয়, তাই জগৎ চলছে।

সেই ভাষা শেখার বুদ্ধি আমাদের আজকেও হয়নি। তাই অনেক উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আমরা চৈতন্যবোধের সংশ্লেষ করতে অক্ষম বহু ক্ষেত্রেই। সৃজন করার শক্তি আমাদের মধ্যে আছে তাই আমরা নিজেরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলছি। অন্য প্রাণীর ভোট নিতে পারলে সত্যিই আমরা শ্রেষ্ঠ কিনা তা প্রতিষ্ঠিত হতো। ওই যে জর্জ অরওয়েল তাঁর Animal Farm-এ উল্লেখ করেছেন, 'Man is the only creature that consumes without producing' এই জন্যই আমাদের বুদ্ধি প্রচুর, কিন্তু বোধ? বোধ কোথায়? যত আধুনিক হচ্ছি, যত মূল্যবান যন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে তত বোধ কমছে। তাই বলতেই হবে, 'Four legs good, two legs bad'— Animalism-এর বিবর্তনবাদে আমাদের কী এল? আমরা বুদ্ধিমত্তার প্রতিযোগিতায় বর্ণ, গোত্র, জাতি, দেশ এবং তারপর বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, বিকাশ সব পেলাম। এখনো পাচ্ছি। কিন্তু দিনের শেষে এমন এক অবস্থার জন্ম যেখানে মানুষ হয়ে যাচ্ছে animal আর চৈতন্যের ঘরে নিয়ম মানার ঘরে, প্রকৃতিকে রক্ষার ঘরে animal-রাই যেন হুঁশযুক্ত। জর্জ অরওয়েল ঠিকই বলেছেন, 'all animals are equal, but some animals are more equal than others' আমাদের মানুষের ইতিহাস exploit করার ইতিহাস, তারপর চৈতন্য, তারপর পরিবর্তন আসতেও পারে।

নৈতিক বিরুদ্ধতা প্রাণীজগতের কেউই করে না মানুষ ছাড়া। আমরা কেবলমাত্রই হোমো সেপিয়্যান্স নয়। ইংল্যান্ডের মতো আমরা জেন্টেলম্যানও নয়। আমরা নিজেদের 'অমৃতস্য পুত্র' বলি। অবোধের যত স্বাভাবিক প্রতিঘাত তার সেই দণ্ডের ওপর দণ্ড চালানোর ক্ষমতা রাখে চৈতন্য বোধের মতো রিফ্লেক্স অ্যাকশান। তা আহরণ করতে হয় জীব ও জড় ধর্মের অনন্ত বিস্ময়ের থেকে। কর্তব্য পক্ষকে দুর্বল করে স্বেচ্ছাচারের শক্তি যদি জগদ্দল পাথরের মতো বসে, তবে চৈতন্যবোধের ডাইনামাইট চেতনা আনবে অণু-পরমাণুর শক্তি সঞ্চার উপায় থেকে, কিংবা বৃক্ষের স্নায়বিক সচেতনা পাঠে, বা গুটিপোকার নিষ্ঠা— জগতের সব স্তরের প্রাণ ও জড়ের মধ্যে যে সংযোগ রক্ষা তার চেয়ে বড়ো বোধ দাতা কিছুই নেই। □

বাংলাদেশের ছাত্র যুব আন্দোলন আজ কলঙ্কিত

চন্দন রায়

পূর্ববঙ্গের অতীতের সকল গৌরবময় ছাত্র যুব আন্দোলনের ইতিহাস আধুনিক স্বাধীন বাংলাদেশের তথাকথিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র যুব আন্দোলনের বীভৎসতায় আজ কলঙ্কিত। পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুব আন্দোলনের সংগ্রামের ইতিহাস ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে শুরু হয়েছিল। সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ দমন পীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্র যুব সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে শামিল হতো। এর সার্বিক ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের পর থেকে। যার ফলস্বরূপ বঙ্গে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রাম সংঘটিত হতে থাকে। বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত এই সমস্ত সংগ্রামের প্রভাবে বঙ্গের ছাত্র যুব সমাজের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত বঙ্গ তথা ভারতের স্বাধীনতা লাভের সংকল্পের বীজ অঙ্কুরিত হয়। তারপরেই বঙ্গের এই অঙ্কুরিত সংকল্প ও স্বপ্ন বিভিন্ন লড়াই, সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারত ব্যাপী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্লাবনে দেশকে ভাসিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ বঙ্গে ইংরেজ শাসক ও শাসন বিরোধী ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, চট্টগ্রাম, বরিশাল ঢাকার মতো বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র যুবদের চরম সংগ্রাম সংগঠিত হতে থাকে। এদিকে ভারতব্যাপী অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ তীব্র আন্দোলনের রূপ নেয়। যখন এই তীব্র আন্দোলন মোকাবিলায় শাসকের হত্যা ও দমন পীড়নের সকল পন্থা ব্যর্থ হলো তখনই শাসকের 'ভাগ করো শাসন করো' নীতি অবলম্বন করলো। ভ্রান্ত পথের দিশারি মুসলিম লিগ ইংরেজ শাসকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে বিভ্রান্ত করে তুললো। সেই নীতির সফল প্রয়োগ ভারত ভাগ— পাকিস্তানের সৃষ্টি। ফলে ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গের নাম পরিবর্তিত হয়ে ইললামি পাক শাসকের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নামক এক নয়া পরাধীন ভূখণ্ড সৃষ্টি করলো।

অচিরেই ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান জনগোষ্ঠীর পাকিস্তানের প্রতি মোহভঙ্গ হলো, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মুসলমান ভাই ভাই সম্প্রীতির মুখোশ খসে পড়লো। পাকিস্তান পন্থী বাঙ্গালি ইসলামিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটলো, তাদের মুসলমান ভাই ভাই স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হলো। পাক শাসকের লোহার খাঁচায় তারা অবরুদ্ধ হলো। আবার তাদের শুরু হলো শৃঙ্খল ভাঙার লড়াই। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুব জনতার কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো 'পাক শাসক তুমি বাঙ্গলা ছাড়ো'। তাদের মুখ থেকে খসে গেল 'হাতমে বিড়ি মুখমে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান— এই পটভূমিতে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃ ও সাধারণ জনগণ উপলব্ধি করলো পাকিস্তানের শাসকবর্গ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, তারা শাসন ও শোষণের চাবুকে জর্জরিত হতে হচ্ছে। এই উপলব্ধির বাতাবরণে পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুব হৃদয়ে ইসলামি সংস্কৃতি সংকুচিত হতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে মননে বাঙ্গালি জাতীয়তার উন্মেষ ঘটতে শুরু করলো। ফলে পূর্ববঙ্গের মাটিতে পর্যায়ক্রমে জন্ম নিল বহু ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল ছাত্র যুব জনতার আন্দোলনের ধারা।

স্বাধীন বাংলাদেশে নিজ দেশে পরদেশী হয়ে প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার আশঙ্কা নিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মাটিতে সংখ্যালঘুদের জন্মগ্রহণ করা পাপ ও অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাষা আন্দোলন : পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করলো। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুব সমাজ প্রতিবাদ করতে থাকে। উর্দুকে মানি না মানবো না হুংকারে সারা পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাস আন্দোলিত হলো, সারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলড়িত করলো। যা ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র যুব সমাবেশে বিস্ফারিত হলো। পাক পুলিশের গুলিতে নিহত রফিক, সালাম, বরকত ও জব্বার-সহ অনেক ছাত্র যুবার রক্তের বিনিময়ে বাংলাভাষা তৎকালীন পাকিস্তানে অন্যতম প্রধান জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। আজ এই মহান ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের দেশে দেশে মহান মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গৌরবের সঙ্গে পালিত হচ্ছে।

জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন : ১৯৫৮ সালের গণতন্ত্র বিরোধী সামরিক সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র যুব জনতার সাহসী লড়াই ক্রমবর্ধমান চাপে ১৯৬২ সালে আয়ুব শাহি সরকার সামরিক আইন তুলে নিতে বাধ্য হয়।

শিক্ষা আন্দোলন : ১৯৬২ সালের পাক সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুব সমাজ এক ঐতিহাসিক আন্দোলন সৃষ্টি করে। আন্দোলন দমন করতে

পাক পুলিশ ছাত্র যুবদের উপর চরম দমন পীড়ন চালায়, এমনকী গুলি করে হত্যা করে। ফলস্বরূপ বাঙ্গালি জাতিসত্তার উন্মেষ তরান্বিত করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ বাঙ্গালি জাতিসত্তার প্রচার ও প্রসারে সম্পৃক্ত হতে থাকে।

ছ' দফা আন্দোলন : এই সমস্ত ছাত্র আন্দোলন থেকে জন্ম হতে থাকে নতুন বাঙ্গালি জাতি সত্তার আন্দোলনের মাইল ফলক। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের প্রতি জাতিগত বৈষম্যের বাস্তব চিত্র রাজনৈতিক মননে জাগ্রত হতে লাগলো। ফলে '৬৬ সালের ৬ দফা দাবি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার হলো এবং পরবর্তীতে এই ৬ দফা দাবি বাঙ্গালি জাতির মুক্তি সনদ হিসেবে বিবেচিত হলো।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিরোধী আন্দোলন : বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরোধিতায় পূর্ববঙ্গব্যাপী ছাত্র জনতার এক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। আন্দোলনে গর্জন উঠে 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। ফলে পাক সরকার মুজিবুর রহমান-সহ ষড়যন্ত্রে জেলবন্দি নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

৬৯-এর অভ্যুত্থান : ছাত্র জনতার এই আপোশহীন লড়াই ৬৯ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্ত শাসনের ও বাঙ্গালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পূর্ণতা লাভ করে। ৬৯-এর চরম আন্দোলনের ঢেউয়ের চাপে তৎকালীন পাক সামরিক সরকার 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতিতে সাধারণ নির্বাচন করতে বাধ্য হয় এবং বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙ্গালি জাতীয়তার জয় ঘোষণা হয়।

৭১-এর অসহযোগ ও স্বাধিকার আন্দোলন : বড়োই পরিতাপের বিষয় যে, সাধারণ নির্বাচনে বাঙ্গালি জাতি জয়লাভ করার পরেও কুচক্রী বাঙ্গালি বিদ্বেষী পাক সামরিক শাসক বাঙ্গালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে পাকিস্তানের শাসন ভার অর্পণ করলো না। ফলে ছাত্র যুব সমাজ জোরদার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলো যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। দলে দলে ছাত্র যুব সমাজ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। পাকবাহিনী ও তাদের স্থানীয় দালালদের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে পৃথিবীর মানচিত্রে শুধুমাত্র বাঙ্গালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন বাংলাদেশ নামক দেশ সৃষ্টি করলো। এটাই তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুব সমাজের সর্বকালের সেরা প্রাপ্তি।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র যুব আন্দোলন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের কারণে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে সরকার বিরোধী তেমন কোনো ছাত্র যুব বা গণ আন্দোলন গড়ে উঠেনি। তাই বলে সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র যুব জনতার ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল না তা নয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর একক নির্দেশে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত শিবির রাজাকার আলবদর বাহিনীদের সাধারণ ক্ষমা, ৭৩/৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সরকারি দলের দাদাগিরি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সরকারি দল আওয়ামি লিগের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র বিরোধী একদলীয় শাসনের পথে পদক্ষেপ ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দলের অস্বীকার ও উপেক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্র জনতার মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে। যার পরিণতিতে জাসদ (জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক দল), নকশাল সর্বহারার মতো ছাত্র যুব সংগঠন সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের চেয়ে বিরোধী ছাত্র যুব সংগঠনের ব্যপ্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তারা সরকার বিরোধী কোনো জোরালো আন্দোলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে রাজপথে সংগঠিত করতে পারেনি। শেখ মুজিব হত্যার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে বাংলাদেশ ব্যাপী এক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালি জাতি ঘটনার ঘনঘটায় স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি শাসকের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বাঙ্গালিরা আশায় বুক বেঁধেছিল এবার তাদের দীর্ঘদিনের লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে, তাঁদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা নতুন দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হলো।

শেখ মুজিব হত্যার পর : পাকিস্তানের রাজনীতির অনুশীলনের মতো স্বাধীন বাংলাদেশে তৎকালীন সামরিক মদতপুষ্ট শাসক শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেই, সামরিক বাহিনীর মধ্যে এক অস্থিরতার পরিবেশে সামরিক কু পালটা কু-এর পরিণতি স্বরূপ মেজর জেনারলে জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক হিসেবে শাসন ক্ষমতায় আসীন হয় এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান সৃষ্ট বিএনপি নামক নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশের মাটিতে আওয়ামি লিগের সমান্তরালে বিএনপি-র যুগ শুরু হলো। ফলে বাংলাদেশের মাটিতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ সৃষ্টি হলো। কিন্তু সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভের কারণে এক দল বিক্ষুব্ধ সেনা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করলো। ফলে নতুন করে বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দিল এবং রাজনৈতিক লড়াই অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়লো। এই রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে আবার বাংলাদেশে সামরিক শক্তি ছিল আওয়ামি লিগ বিরোধী এবং সর্বোপরি ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী পরাজিত পাকপন্থী রাজনৈতিক শক্তি জোট। উভয় শক্তির রাজনৈতিক চাপে ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম এবং আরবি ভাষা শিক্ষা বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাঠক্রমে বাধ্যবাধকতা ঘোষণা করা হলো। এই ঘোষণা বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রেমী ছাত্র যুব সমাজ মান্যতা দিল না।

৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উত্তরসূরি ছাত্র যুব সমাজ ছাত্র রাজনীতি আন্দোলনের এক আলোর দিশা দেখতে

পেল। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মতো কোটি কণ্ঠে হুংকার দিল 'মানি না মানবো না' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হুংকার রাজপথে এল, দেশব্যাপী হুংকার প্রতিধ্বনিত হয়ে গর্জনে পরিণত হলো। ১৯৯০ সালে এরশাদ শাহি শাসকের মসনদ নড়বড়ে হয়ে পড়লো, ছাত্র জনতার জয় হলো, এরশাদ শাহির পতন হলো। এটাই ছিল শেখ মুজিব হত্যা পর বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ছাত্র জনতার আন্দোলন।

এই আন্দোলনের সফলতার ফলে কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলো। কিন্তু বিধি বাম, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আকাশে কোটা বিরোধী এক ছাত্র যুব আন্দোলনের কালো মেঘ ঘনীভূত হলো। কোটা আইনের সপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের ঐতিহ্যর পরম্পরার ছাত্র যুব সমাজ আবার হুংকার দিল, এই আইন 'মানি না মানবো না' এই হুংকার মিছিল প্রতিষ্ঠান থেকে আবার রাজপথে এলো, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র যুব জনতা এক হয়ে গেল।

শেখ হাসিনা সরকারের কোটা বিরোধী আন্দোলন মোকাবিলায় ব্যর্থতার কারণে হাসিনা সরকার বিরোধী দেশি বিদেশি শক্তিচক্র এই কোটা বিরোধী ছাত্র যুব আন্দোলনকে দেশ ব্যাপী এক ভয়ংকর আন্দোলনে পরিণত করলো এবং এই আন্দোলনের তীব্রতায় সামান্য কোটা বিরোধী আন্দোলন হাসিনা সরকার পতনের কারণে সরকার পরিণত হয়ে গেল। আন্দোলনের তীব্রতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করলো। এটাও পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুব আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। তবে স্বর্ণাক্ষরে নয়, কলঙ্কের কালি দিয়ে লেখা থাকবে।

বাংলাদেশের এই ছাত্র যুব জনতার সফল আন্দোলনের একটা লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী যুগে যুগে দেশে দেশে ক্ষমতাসীন শাসক সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর অমানুষিক দমন পীড়ন, এমনকী নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। আন্দোলনের চাপে কখনো শাসক ক্ষমতাচ্যুত হয় না, দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়, কিন্তু বিজয়ী ছাত্র যুব জনতা সুস্থ ধারার নান্দনিক বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে আত্মহারা হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিজয়ী জনতা নতুন সরকার গঠন করে শাসন পরিচালনা করে। বিজয়ী ছাত্র জনতা কোথাও কোনো ধ্বংস লীলা করে না, সরকারি সম্পত্তি বা পরাজিত বিরোধী সমর্থকদের বিষয় সম্পত্তি লুট অগ্নি সংযোগ করা বা হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে না। দেশে কঠোর আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করে। কিন্তু বাংলাদেশের এই বৈষম্য বিরোধী বিজয়ী ছাত্র জনতা বিজয় উল্লাসের নামে নজিরবিহীন অমানবিক সন্ত্রাস, অরাজকতা ও ধ্বংসযজ্ঞের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, যা মধ্যযুগীয় বিজয় উল্লাসকেও হার মানায়। সরকারি সম্পত্তি, কলকারখানা, মেট্রো রেল, জাতীয় টিভি ভবন, এমনকী গণভবন পর্যন্ত বিজয়ী ছাত্র জনতা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস করলো। গণভবনের মহিলাদের অন্তর্বাস এবং বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের সঙ্গে এমন সব দৃষ্টিকটু ও লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলো যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যা জঘন্যের মধ্যে জঘন্যতম নিদর্শন।

সব দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, পুলিশ বাহিনী শাসকের নির্দেশের প্রোটোকল মানতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের পুলিশ, আনসার ও সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তার ব্যাতিক্রম নয়। তাই শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন মোকাবিলায় শাসকের নির্দেশের বাধ্যবাধকতায় বাহিনী সদস্যদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের উপর দমন পীড়ন চালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু অতি দুঃখের ও মর্মান্তিক বিষয় আন্দোলনকারীরা পুলিশের উপর সরকারি নির্দেশের বিচার বিবেচনা না করে অমানবিক নারকীয় উল্লাসে রাজার বাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের নিরীহ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আঘাতে আঘাতে তাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে হত্যা করলো। শুধু হত্যা করে উল্লাসের মত্ততা নিরসন করেনি, পুলিশের মৃতদেহগুলিকে উড়ালপুলের রেলিং থেকে সর্ব সাধারণের দর্শনের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়। এখানেই শুধু ক্ষান্ত নয়, সারা দেশের প্রান্তে প্রান্তে পুলিশ থানাগুলির ভিতর পুলিশ সদস্যদের অবরুদ্ধ করে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই পৈশাচিক হত্যালীলা ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে পাক সেনা কর্তৃক বাঙ্গালি পুলিশ বাহিনীর উপর সংগঠিত হত্যাযজ্ঞ ও মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়।

এই বর্বর দানবীয় নারকীয় নরপশুতুল্য বৈষম্য বিরোধী ছাত্র যুব জনতার আন্দোলনের হিংস্র থাবা থেকে বাংলাদেশে বসবাসরত সনাতনী হিন্দু-সহ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী রেহাই পায়নি, এমনকী জনজাতি ও পাহাড়ি জনজাতিও তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। সংখ্যালঘুদের বিষয় যে, সম্পত্তি লুট, মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন এবং হত্যা ৭১-এর পাকপন্থীদের নিষ্ঠুরতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় স্বাধীন বাংলাদেশে নিজ দেশে পরদেশী হয়ে প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার আশঙ্কা নিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মাটিতে সংখ্যালঘুদের জন্মগ্রহণ করা পাপ ও অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েকশত বছর ধরে বহু সরকার ও শাসক বিরোধী ছাত্র যুব জনতার আন্দোলন, সংগ্রামের পীঠস্থান পূর্ববঙ্গের পবিত্র ভূমি। হানাদার সুলতানি ও মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে বঙ্গের বারো ভুঁইয়াদের আপোশহীন যুদ্ধের ইতিহাস আজও বঙ্গের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। ইংরেজ শাসক বিরোধী বহু আন্দোলন সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। দীর্ঘ ২৫ বছর হিংস্র পাক শাসক বর্গের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমিক সর্বস্তরের জনতার ক্রমবর্ধমান চরম আন্দোলনের ফলস্বরূপ বাঙ্গালি জাতির অহংকারের বাংলাদেশ। আজ সেই স্বাধীন বাংলাদেশে কোটা ও বৈষম্য বিরোধী জেহাদি ছাত্র যুব জনতার আন্দোলনের নামে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলো সমগ্র বঙ্গের বিগত দিনের যুগে যুগে সকল সফল সোনালি গৌরবের আন্দোলনকে বঙ্গের পবিত্র মাটিতে করব দিয়ে এক কলঙ্কিত ছাত্র জনতার অভিশপ্ত আন্দোলনের জন্ম দিল। □

রাক্ষস ও ব্রাহ্মণ

এক গভীর বনের মধ্যে একটি বিশাল তেঁতুলগাছ ছিল। সেখানে মনের সুখে বাস করত এক রাক্ষস। তার নাম ছিল চণ্ডকর্মা।

একদিন বনের মধ্যে চণ্ডকর্মা রাক্ষস এক ব্রাহ্মণকে ওই গাছের নীচে দিয়ে যেতে

দেখল। সে চিৎকার করে বলল, ওহে ব্রাহ্মণ, দাঁড়াও, ওই যে সামনে পুকুরটা রয়েছে, ওখানে আমি স্নান করতে যাব, তুমি কাঁধে করে আমাকে ওই পুকুরপাড়টায় পৌঁছে দাও তো। আর হাঁটতে ভালো লাগছে না।

ব্রাহ্মণ আর কী করে। না বলবে এমন সাহস নেই। আবার অত মোটা ও ভারী রাক্ষসকে কীভাবে বয়ে নিয়ে যাবে সেও আর এক চিন্তা। ভয়ে ভয়ে সে রাক্ষসের কাছে এসে মাথা নীচু করে বসল। রাক্ষস তার কাঁধে আরাম করে বসল। কোনোমতে চলতে চলতে ব্রাহ্মণের খালি মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ঘাড়টা মটকে দেয়। আজ তার কপালে যে মরণ লেখা আছে তা ব্রাহ্মণ বুঝে গেছে। ঘাড়ে যখন চেপে বসেছে, তখন অত সহজে নিস্তার পাওয়া যাবে না।

চলার সময় ব্রাহ্মণের পেটের কাছে রাক্ষসের পা দুটো ঝুলছিল। ব্রাহ্মণ দেখল রাক্ষসের পা দুটো পদ্মের পাঁপড়ির মতো কোমল। ব্রাহ্মণের আবার সব বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বভাব। যা দেখত, যা শুনত তা নিয়ে তার মাথায় হাজার প্রশ্ন ঘুরপাক খেত। কখনো বই পড়ে, কখনো কাউকে জিজ্ঞাসা করে সে তার হাজার কৌতূহলের সমাধান করার চেষ্টা করত। অজানা বিষয়ে জানার নেশা যেন তাকে ভর করে থাকত।

কিন্তু রাক্ষসের কাছে সে তো জানতে চাইতে পারে না যে লোহার মতো শরীরে তার পা দুটো অত নরম হলো কী করে।

মনের মধ্যে প্রশ্নগুলি আকুলি বিকুলি করতে লাগলেও ভয়ে সে চুপ করে ছিল। পাছে রেগে গিয়ে রাক্ষস তার ঘাড় মটকে দেয়। কিন্তু স্বভাবকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সে বলেই ফেলল, তোমার পা দুটো পদ্মের পাঁপড়ির মতো এত নরম হলো কী করে?

রাক্ষস গর্ব করে বলল, আমার শরীরটাও ফুলের মতোই নরম তুলতুলে। শুধু পা দুটোই নয়।

ব্রাহ্মণ আবার প্রশ্ন করল, সে কথাই তো জানতে চাইছি। এমনটা হলো কী করে? তোমার গায়ে এমন শক্তি, এমন তাগড়াই চেহারা, এ বন সে বন ঘুরে বেড়াও, কত লম্ফঝম্ফ কর, তাহলে?

রাক্ষস হেসে বলল, এর একটা কারণ আছে। আসলে আমার একটা ব্রত আছে। আমি কখনোই ভিজে অবস্থায় মাটিতে পা দিই না। এই ব্রত পালনের ফলেই আমার শরীরটা এত নরম তুলতুলে।

ব্রাহ্মণ আর রাক্ষস দিব্যি গল্প করতে করতে পৌঁছে গেল পুকুরপাড়ে। রাক্ষস ঘাড় থেকে নেমে বলল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, চলে যাবে না কিন্তু। আমি স্নান সেরে, পূজা করে তারপর আসব। আমি না আসা অবধি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার কাঁধে চেপেই আমি আবার বনের মধ্যে ওই তেঁতুলগাছে উঠবো।

রাক্ষস ব্রাহ্মণের ঘাড় থেকে নেমে স্নান করতে গেল। পুকুরের জলে মনের সুখে স্নান করতে লাগল। পাড়ে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগল, রাক্ষস কী আমায় ছেড়ে দেবে? স্নান সেরে, পূজা করে, আবার আমার কাঁধে চেপে গাছতলায় গিয়ে আমাকে মেরে খেয়ে ফেলবে। এইবেলা যদি পালিয়ে যাই তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাক্ষস তো আর ভিজে পা মাটিতে রাখবে না। তাই আমাকে দেখলেও ছুটতে পারবে না। ভাগ্যিস, কথায় কথায় তার ব্রতের কথা জানতে পেরেছিলাম!

তারপরই ব্রাহ্মণ দিল এক ছুট। লোকটাকে ছুটতে দেখে রাক্ষস তাড়া করবে ভাবল কিন্তু নিজের ব্রতের কথা মনে করে ভিজে পা মাটিতে রাখতে পারল না। দাঁড়িয়ে রইল পুকুরের জলেই।

এদিকে ব্রাহ্মণ ছুটতে ছুটতে গ্রামের পথে গিয়ে পড়ল।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

ওরাং

অসম রাজ্যের দরং ও শোণিতপুর জেলায় অবস্থিত এই উদ্যান। এর আয়তন ৭৮.৮১ বর্গকিলোমিটার। ১৯৮৫ সালে এই উদ্যানকে অভয়ারণ্য এবং ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল জাতীয় উদ্যানরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পৃথিবী বিখ্যাত একশৃঙ্গ গণ্ডারের বাসস্থান হওয়ায় ওরাং উদ্যানকে মিনি কাজিরাঙা বলা হয়ে থাকে। এই উদ্যানে ২৬টি কৃত্রিম জলাশয় এবং ১২টি জলাভূমি রয়েছে। এগুলিতে ৫০ প্রজাতির মাছ দেখা যায়। বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির পাখির কারণে পার্কটি বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনালের গুরুত্বপূর্ণ পাখি এবং জীববৈচিত্র্য এলাকা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন জীবজন্তু ছাড়াও ৭ প্রজাতির কচ্ছপ দেখা যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৫০

ঈ-কারান্তে স্ত্রীলিঙ্গে

সা – তা: (সে– তারা)

তা: কা ? (তারা কারা ?)

সা ভগিনী। তা ভগিন্য:। (সে বোন। তারা বোন)

অভ্যাস কুর্ম:--

সা দেবী– তা: দেব্য:।

সা জননী– তা: জনন্য:।

সা নর্তকী– তা: নর্তক্য:।

সা পুত্রী– তা: পুত্র্য:।

সা সখী– তা: সখ্য:।

প্রয়োগ কুর্ম:

রাক্ষসী,সুন্দরী,মমতাময়ী,বান্ধবী,অর্ধাঙ্গিণী,রমণী, অঙ্কনী, সমদর্বী, মার্জনী, শ্রেণী।

ভালো কথা

ঠাকুমার গোপালঠাকুর

আমার ঠাকুমা প্রতি মাসে দুবার একাদশী করেন। সেদিন ঠাকুমা সারাদিন শুধু গঙ্গাজল খেয়ে থাকেন। আর কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। কথা না বলেই ঘরের এটা সেটা কাজ করেন। কিন্তু মনে হয় যেন কারও সঙ্গে কথা বলছেন। একাদশীর পরদিন সকালে পূজা করার পর মুখে কিছু দেন। তারপর কথা বলেন। এবারে একাদশীর পরদিন ঠাকুমার পূজা হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, একাদশীর দিন তুমি কারও সঙ্গে কথা বলো না কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি কারও সঙ্গে কথা বলছ। ঠাকুমা হেসে বলেন, ওদিন আমি সারাক্ষণ আমার গোপালঠাকুরের নাম জপ করি।

বিদিশা মহান্তি, বরাবাজার, নবম শ্রেণী, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) প পু ন ত্র	(১) দূ দূ রা ন্ত র
(২) শ বি তি দে	(২) ন দে ব হা সা

২৩ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) সমালোচনা (২) শতবার্ষিকী

২৩ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বিজয়কেতন (২) রাঘববোয়াল

উত্তরদাতার নাম

(১) সমাদৃতা ঘোষ, ই বি, মালদা। (২) আদিত্যরাজ মিশ্র, নেতাজী মোড়, মালদা। (৩) শিবম রায়, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) যাজ্ঞশ্রী রায়, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

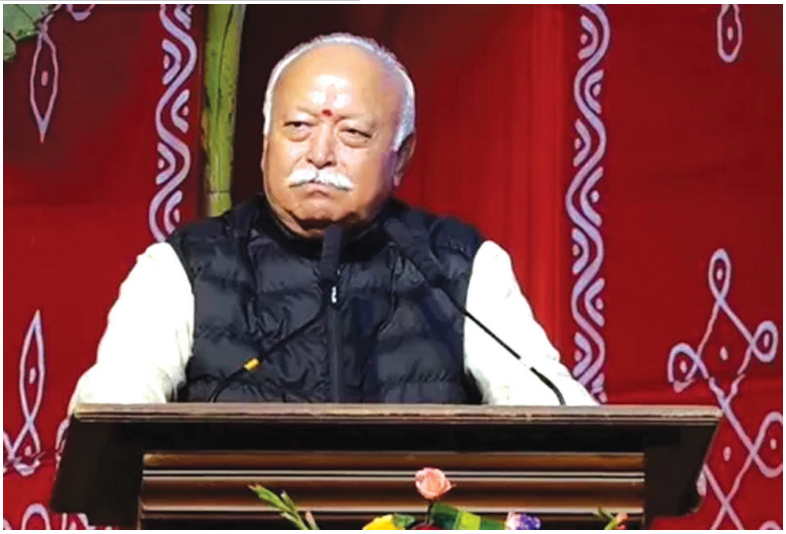

মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ভারতকে অমরত্ব প্রদান করে 'অমর ভারত' তৈরি করার জন্য আমাদের সঠিকভাবে মন্থনের কাজ করে যেতে হবে।

মন্থনের মাধ্যমে অমৃত উৎপন্ন করে সমাজকে প্রদান করা আমাদের কাজ : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

লোক, সৃষ্টি ও ধর্ম এই তিনটি তত্ত্বেরই উৎপত্তিকাল সমসাময়িক। উৎপত্তির সময়কাল থেকে প্রলয় পর্যন্ত এই তত্ত্বত্রয় একত্রে অবস্থান করে বলেই তা সনাতন। এই তিনটি তত্ত্ব একত্রে থাকার কারণেই জগতের অস্তিত্ব বর্তমান। তা 'একোহম্ বহুস্যাম্' ধারণাকেই পোষণ করে। যা সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানে যা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যার লয় অবশ্যম্ভাবী, তিনটি ক্ষেত্রেই এই ত্রিতত্ত্ব মেনে চলে। এই ধারণা আমরা যদি ভারত বহির্ভূত কোনো দেশের বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করি, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে আমরা ভারতীয়। কারণ হলো আমাদের ভিত্তি। পূর্বপুরুষেরা সেই ভিত্তি তৈরি করে গিয়েছেন। এই বক্তব্য কোনো ব্যক্তিগত বক্তব্য নয়। এই বক্তব্যের আধিভৌতিক নির্যাস ভারতের আত্মাকে সংজ্ঞায়িত করে। যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষেরা সর্বদা এই সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন, তাই তাঁরা সত্যকে লাভ করেছেন। আর বিশ্ব সংসারে যারা সত্যকে খোঁজেননি তারা থমকে গেছেন। সত্যকে লাভ করতে পারেননি। কিন্তু এই সত্যকে অন্বেষণের কারণ কী? এই অন্বেষণ অন্তরের আনন্দ, সুখানুভব ও মনের সন্তুষ্টি বিধানের কারণ হয়ে থাকে। এই অন্বেষণের নিরন্তর প্রয়াস পথে চেতনা, জড়জগৎ ও সৃষ্টিকে অতিক্রম করে যেতে হয়। সেই সুখের অন্বেষণ অনেকেই করেন। কিছু খুঁজে পেতে গেলে সাধনা অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যা কিছু পেয়েছি তা পার্থিব আবরণে ঢাকা। তাই সত্যকে খুঁজতে মানুষ প্রথমে পার্থিব জগতেই ঘোরাফেরা করতে থাকে। প্রাথমিক অনুভবে মনে হতেই পারে সত্যের পথের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু পরক্ষণেই সেই পথের প্রাসঙ্গিকতা ম্লান হতেই সে ভুল ভাঙতে থাকে। শাশ্বত সুখ অধরাই থাকে।

এর কারণ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পার্থিব জগতে পাওয়া যায় না, আবার পার্থিব জগতে বাস করে জড়কে অস্বীকার করে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই। এই জড়জগতে যাবতীয় উপকরণ জীবনকে ঋদ্ধ করলেও একটা সময় মোহের অবসান ঘটে, তারপর বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়। আর ঠিক এখানেই মানুষ থমকে দাঁড়ায় ভোগবাদ ও অধ্যাত্মের সন্ধিক্ষণে এসে। এমনটাই হয় মানুষের জীবনধারা। মানুষ জন্ম নেয়, তারপর প্রকৃতির নিয়মে কামনা-বাসনা পূর্তির উদ্দেশ্যে নিরন্তর ছুটতে থাকে। সুখের সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে কখনো হতাশ হয়ে বসে পড়ে, বিরক্ত হয়। তারপর ভেতরে ভেতরে দহন জ্বালায় জ্বলতে থাকে। জ্বলতে জ্বলতে একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর কোনো এক সময় মৃত্যুবরণই যে শেষ পরিণতি একথা চিন্তা করে মানুষ থমকে দাঁড়ায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা থমকে থাকেননি। সেই আকাঙ্ক্ষিত আধিভৌতিক সুখ বহির্জগতে যখন অধরা থেকে গেল, তা অনুধাবন করে তারা তখন বহির্জগৎ ছেড়ে অন্তর্জগতে অন্বেষণ করেন। শেষে তারা উপলব্ধি করেন, সমগ্র অস্তিত্বে একমাত্র একত্বই সত্য। এতদিন তারা যা খুঁজছেন অর্থাৎ তাদের আকাঙ্ক্ষিত সত্য, তা একত্বের মধ্যেই বিদ্যমান। অন্য কোথাও তা নেই। সৃষ্টির খেয়ালে একের প্রকাশ ঘটে বহুত্বে। তাই বিবিধের মাঝে আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ঘটে একাত্মতার উত্তরণ। এই কারণে বিবিধতা একটি ভ্রম মাত্র। বিবিধতায় একটি সত্ত্বারই বহুবিধ প্রকাশ ঘটে। একতা একটি শাশ্বত সত্য। আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অন্বেষণ শেষে তাই-ই উপলব্ধ হয়, বিবিধতা এসে মেশে একতায়। কারণ এক থেকে বহুর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই চিরন্তন সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এটাও তারা

ফঃ ৬

উপলব্ধি করেছিলেন যে, এক থেকে বিবিধতার প্রকাশ হেতু, এই বিশ্ব সংসারের সকল সজীব সৃষ্টি আমাদের নিজেদের একক সত্ত্বার বহুবিধ প্রকাশ। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে আমরা সবাই এক। এই কারণে সবার সুখের মাধ্যমেই আমরা আমাদের সুখ খুঁজে পেতে পারি। সর্বসাধারণের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণকর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার পরেও যদি কিছু ফাঁক থেকে যায়, সেই ফাঁকে থাকা অকিঞ্চিৎকর ক্লিষ্ট জনসাধারণ, সর্বসাধারণের সুখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বাস্তবে নিজেদের সুখ ও শান্তি পেতে গেলে সবার সুখ ও সন্তুষ্টি ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজ জীবনে তার বাস্তবিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে এটাও বুঝতে পারেন যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য এমন একটি সার্বিক সমাজব্যবস্থা প্রয়োজন যার প্রয়োগ ক্ষেত্র বিশাল। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ভারত নির্মাণ করেন। ভারত নির্মাণ কীভাবে হয়েছে? ভারতবর্ষ একটি সনাতন রাষ্ট্র। বিশ্বের ইতিহাস সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের অস্তিত্ব বর্তমান। আমাদের সেই সময়কার জীবনধারার সঙ্গে আজকের জীবনধারার বিচারে বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি পরিবর্তন হলেও আমাদের মননের কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তখনও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনটাই আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই বিষয়টি ভারত ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। কারণ তৎকালীন ঋষিগণ সমাজের কল্যাণে সকলের চিন্তাভাবনার সংস্কার সাধন করা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। এর কারণে তারা একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ভারতরাষ্ট্র নির্মাণ করেছিলেন। সেই আবহমানকাল থেকেই বয়ে চলেছে এই রাষ্ট্রের উন্নত সংস্কৃতির ভাবধারা। এই ঋষিরা বাস করতেন অরণ্যে। তাঁরা গৃহস্থ ছিলেন, কৃষিকাজও করতেন। অরণ্যে তাঁদের গার্হস্থ্য জীবন ও কৃষি জীবন এই দুই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা লব্ধ সংস্কারে তাঁরা তিলে তিলে আমাদের তৎকালীন সমাজজীবন গড়ে তুলেছিলেন। সেই সংস্কারের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের জনজীবন সংগঠিত হয়েছিল এবং আমাদের শাস্ত্রসমূহ রচিত হয়েছিল।

হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম্, অর্থাৎ হিমালয় থেকে শুরু করে সমগ্র দেশের ব্যক্তিবর্গ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন, শ্রেণী ও পেশা নির্বিশেষে একই সংস্কারে ঋদ্ধ ছিলেন। আমাদের ঋষিগণ এই সংস্কার সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত ছিলেন। সেই অবগতি শুধুমাত্র তাঁদের অনুভবে নয়, তাঁরা ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ করেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে এই সংস্কৃতি প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো? বাস্তবে ঋষিগণ একটা সময় তাঁদের গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষের কোণে কোণে এই জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন। বিদ্যা-অবিদ্যা, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি ব্যবহারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতার আধারে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রতিটি ঘরে পৌঁছেছিলেন। আজ আমরা যাদের জনজাতি, বনবাসী বলছি তারা কোনো পরিস্থিতির শিকার হয়ে জঙ্গলে বসবাস করতে যাননি। অরণ্যজীবন তারা বেছে নিয়েছিলেন। অরণ্যে তাদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা ছিল। ব্যবস্থা ছিল স্বশাসিত ও স্বায়ত্তাধীন। রাজা বা প্রধানের পরিচালনা ছিল মর্যাদাপূর্ণ ও সুশাসনোচিত। এমনভাবেই অধিকাংশ বনবাসী সমাজ স্ব-ব্যবস্থায়, স্ব-শক্তিতে, স্বনির্ভর হয়ে স্ব-গোষ্ঠীকে পরিচালনা করতেন এবং সুরক্ষা-সহ অরণ্যের পরিধি বিস্তার করে চলতেন। সমাজে যার যতটুকু প্রয়োজন, যোগ্যতানুযায়ী, ন্যায়ধর্মানুযায়ী তার ততটুকুই প্রাপ্য ছিল। জঙ্গলজীবনে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ।

দেশের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং সর্বোচ্চ আদালতের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের এই বিচারব্যবস্থা যে আইনশাস্ত্র মেনে চলে তা কি আমাদের স্বদেশীয়? দু'জনের উত্তর ছিল 'না'। জিজ্ঞেস করেছিলাম কী কী পার্থক্য আছে? তাঁরা বলেছিলেন, এই আইন 'রুল অব ল' মেনে করা হয়েছে। তা এই 'রুল অব ল' বিষয়টি কী? কোথা থেকে এসেছে? এর পেছনে একটা কাহিনি আছে। ফ্রান্সের উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার ইংল্যান্ড আক্রমণ করেন। তখন ইংল্যান্ডে ছিল অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির বসবাস। উইলিয়ামের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক নরম্যান জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে ইংল্যান্ডে। নরম্যান (যারা যোদ্ধা ও উইলিয়ামের অনুগামী) ও স্যাক্সনদের (ইংল্যান্ডে বসবাসকারী) সাহায্য নিয়েই উইলিয়াম ইংল্যান্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধ জয়ের পর উইলিয়াম নিজস্ব শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় বিদ্বানদের প্রলুব্ধ করে তাদের সাহায্যে বিভিন্ন আইনকানুন বানিয়ে অ্যাংলো স্যাক্সন ভূস্বামীদের মালিকানায় থাকা জমি কৌশলে হস্তগত করে সেই ভূসম্পত্তি বিপুল সংখ্যক নরম্যানদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় এবং অ্যাংলো স্যাক্সনদের ইংল্যান্ড ছাড়তে বাধ্য করা হয়। যে আইন উইলিয়াম তৈরি করেছিলেন, সেই আইনই হলো 'রুল অব ল'। এই ল-এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো 'King can do no Wrong'। ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থার ওপর সমষ্টিগতভাবে সমাজের প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈদেশিক অনুপ্রবেশ ঘটে বিশেষ করে ইংরেজদের আগমন, কালক্রমে তারা ভারতীয় সমাজের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে আমাদের কাছ থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেয়। কারণ আমাদের দেশ থেকে অর্থসম্পদ লুঠ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এ ছিল আমাদের চরম বিপর্যয়। ধীরে ধীরে আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছে গেলাম যে, এক সময় এই সম্পদের মালিক যে আমরা ছিলাম, তা বলতে সঙ্কোচবোধ হয়। আমাদের একথা বলতেও লজ্জা হয় যে, আমরা এক সময় একটি মৌলিক সমাজব্যবস্থার অঙ্গ ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ ছিল না। আমাদের ইতিহাস-সহ সমস্ত কিছু নষ্ট করে আমাদের সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে ভারত সম্পর্কে কোনো বিমর্শ তৈরি হলে তা সাধারণত নেতিবাচক ও অসুস্থ বার্তাতেই ভর্তি থাকে। এই বিমর্শ যাতে সুস্থভাবে গঠিত হয় তার উদ্দেশ্যেই লোকমন্থনের আয়োজন।

কিন্তু এ কথাও মাথায় রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র বৈদেশিক আক্রমণই এই দুরবস্থার কারণ নয়। বৈদেশিক শক্তির এত ক্ষমতা ছিল না ভারতের মতো এমন একটি সুনিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী দেশকে খণ্ডিত করতে পারে। তাদের সেই আগ্রাসী ক্ষমতা আজ নেই। তারা

আমাদের খণ্ডিত করতে পেরেছিল তার কারণ ছিল আমাদের নৈতিক অধঃপতন। দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ,সমর্থ, সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত জীবনযাপন করার পর আমাদের কেন নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল তার কারণ জানা যায় না।

আমরা কারা? আমাদের কর্তব্য কী? জীবন থেকে আমরা কী খুঁজি এবং কীই-বা পেতে চাই তা জানি না। এই প্রশ্নেগুলির উত্তর আমরা খুঁজিও না। মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্য 'মৃচ্ছকটিকম্' পড়লে আমরা এই বিষয়গুলি যেমন দেখতে পাই। মহাভারতেও এই বিষয়গুলি প্রসঙ্গক্রমে বারংবার ঘুরেফিরে এসেছে। যা পড়লে মনে হয় আজকের সমাজব্যবস্থা বেশ খানিকটা অধঃপতিত হয়েছে। এতটাই অধঃপতন হয়েছে যে আমরা নিজেদের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক রাখতেই ভুলে গেছি। কিন্তু কেন ভুলেছি? কারণ এই শরীরের ভেতরে থাকা জীবন তা বিস্মৃত হয়েছে। এই শরীরর আমাদের পূর্বপুরুষদেরই দান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাষ্ট্রনির্মাণ কিসের জন্য?

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।। অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের নিজেদের চরিত্র, আচার-আচরণ ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হলে, এই দেশে জন্মগ্রহণকারী, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের সাহচর্যে তাকে আসতে হবে।

আধ্যাত্মিক আধারে এই ভৌতিক জীবন কেমনভাবে চলবে? জীবনে অর্থ ও কাম সঠিকভাবে বজায় রেখে মোক্ষ লাভ করতে গেলে ধর্মের অনুশাসন থাকা জরুরি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের সংজ্ঞা কী? ধর্ম হচ্ছে একাত্মতার আধারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকা বহুত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে কীভাবে সম্মিলিতভাবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত জীবন চালনা করা যায়। সৃষ্টির নিজস্ব একটি ধর্ম আছে। সেই ধর্মের ভিত্তিতেই সৃষ্টি চলতে থাকে। সেই ধর্মের স্খলন হলেই সৃষ্টি ধ্বংস হয়। একটি প্রশ্ন এসেছিল খাদ্য শৃঙ্খল সম্পর্কে। খরগোশ যেমন শেয়ালের খাদ্য, তেমন শেয়ালও কারও না কারুর খাদ্য। এভাবেই প্রকৃতিতে খাদ্য শৃঙ্খল চক্রাকারে চলতে থাকে, এটাই সৃষ্টির ধর্ম। এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। একবার একটি পায়রা বাজপাখির তাড়া খেয়ে রাজা শিবির রাজসভায় ঢুকে পড়ে। পায়রাটি ভয়ে কাঁপছিল। রাজা তাকে আশ্রয় দেন এবং লুকিয়ে রাখেন। ঠিক তখনই একটি বাজপাখি উড়ে এসে রাজা শিবিকে বলল, হে মহারাজ, আমার শিকার আমাকে ফিরিয়ে দিন। রাজা শিবি বললেন, ''এই পায়রাটি আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আমি একে কিছুতেই আপনাকে দিতে পারি না। ওকে রক্ষা করা আমার ধর্ম।''

বাজপাখি বলল, রাজা, তুমি ধর্মের কথা বলছ? আমি ক্ষুধার্ত আর এই পায়রাটি আমার খাবার। প্রকৃতি আমাকে এই ধর্ম দিয়েছে। ওকে খাওয়াটাই আমার ধর্ম। তুমি যদি আমার ধর্ম নষ্ট করে নিজের ধর্ম সুরক্ষিত রাখতে চাও তাহলে তা ধর্ম নয়, সেটা অধর্ম।

রাজা শিবি উত্তর দিলেন, তোমার ধর্ম পায়রাটিকে খাওয়া, আমার ধর্ম পায়রাটিকে বাঁচানো। কিন্তু তোমাকে যে পায়রার মাংসই খেতে হবে এমন বিষয় তো নয়। সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে আমার শরীর থেকে পায়রার ওজনের সমান মাংস কেটে দিতে পারি। নিজের শরীরের মাংস দিয়ে আমি আমার ধর্ম রক্ষা করব।

> "ভারতকে উঠে দাঁড়াতে হবে। ভারতকে বড়ো হতে হবে। তাই বৃহৎ সমাজকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। সঠিক শব্দে বিষয়টি প্রকাশ করতে পারলে এই কাজ আমাদের সম্পূর্ণ হবেই এতে কোনো ভুল নেই।"

এটা সৃষ্টির ধর্ম। জমিতে ব্যাং বাস করে, তার কারণ ফসলে পোকা লাগলে ব্যাং সেই পোকা খেয়ে ফেলে। এতে ফসল রক্ষা পায়। একবার এক চাষি বিনোবা ভাবেজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। চাষি বিনোবাজীকে বললেন যে খেতে প্রচুর পোকা হয়েছে। ফসল নষ্ট হচ্ছে। বিনোবাজী বললেন আরও ব্যাং ধরে ধরে ল্যাবরেটরিতে পাঠাও। অর্থের লোভে চাষিরা ব্যাং ধরে ধরে ল্যাবরেটরিতে চালান করত। বিনোবাজীর একথা বলার উদ্দেশ্য, খেতে ব্যাঙের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

এখন কথা হচ্ছে পোকা খেয়ে ব্যাং হিংসা করছে না? অবশ্যই করছে, কিন্তু এই হিংসার কারণে অনেক কিছু বেঁচে যাচ্ছে। এটাই সৃষ্টির ধর্ম। সৃষ্টির এই ধর্মচক্রকে উপলব্ধি করে, সৃষ্টির নিয়ম মেনে চললে আমরা সবাই সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ থাকব। আমরা সৃষ্টিকে সঠিকভাবে রক্ষা করলে সৃষ্টিও আমাদের দু'হাত ভরে দেবে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন:

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।৩।১৬

অর্থাৎ যে পুরুষ এই পৃথিবীতে সৃষ্টির চক্র অনুযায়ী নিজের কর্তব্য পালন করে না, অর্থাৎ ভোগে মত্ত, পাপপূর্ণ জীবনযাপন করে সে মানুষ বৃথা বেঁচে থাকে।

মানুষের এই পৃথিবীর প্রতি অনেক দায়িত্ব রয়েছে, যা পালন করা একান্ত প্রয়োজন। এই ধর্মের শিক্ষা পৃথিবীর সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের ধ্যেয় এই জীবনধারার শিক্ষা আমরা সকলে ভুলে গিয়েছি। শিক্ষার অনভ্যাস ও সীমিত প্রয়োগ জীবনে সীমাবদ্ধতা নিয়ে এসেছে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে মন সমবেদনা, সহমর্মিতার মতো গুণগুলি হারিয়ে ফেলেছে। তাই সম্পর্কও ছিন্ন হয়েছে। আর এই গুণগুলি হারিয়ে আমরা ধর্মের নামে অশেষ অধর্ম করে চলেছি। এই কারণে স্বামীজী বলেছেন— প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও বিকৃতি এই তিন ক্ষেত্রের আধারে প্রবহমান

জীবনশৈলীতে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সংস্কৃতির বিকাশ হোক এবং বিকৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত থাক, জীবনে এটাই কাম্য। জীবনে যাতে বিকৃতি না আসে সে বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সেই শিক্ষা বিস্মৃত হওয়ার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের শিকারে পরিণত হয়েছি। আমাদের যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তাই-ই নিয়ে এখন উভয়মুখী সংগ্রামে নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছি। সন্ত তুকারাম বলেছেন, আমাদের জীবনে দিবারাত্রি যুদ্ধ চলছে, মনের মধ্যে নিজের সঙ্গে, আবার বাইরে জগতের সঙ্গে।

হয়তো কেউ তাঁকে বলেছিলেন, আপনি তো দিনরাত হরিনাম করেন, বাইরে এত অত্যাচার, হাতে তলোয়ার নিয়ে আপনি যুদ্ধ তো করেন না সেই প্রসঙ্গেই হয়তো তার এই উক্তি ছিল।

ভেতরে বাইরে আমাদের কাজেরও এমনই দুটো ধারা। আমাদের সমাজের এই নষ্ট ভাবধারা আমাদেরই সংশোধন করতে হবে। কারণ আজকের যত সমস্যা শুধুমাত্র সমাজের ইতিবাচক ভাবনা ক্ষীণ হওয়ার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। একবার যদি আমাদের এই বোধ পুনর্জাগরিত হয় যে, আমরা এক; বনবাসী, গিরিবাসী, নগরবাসী, গ্রামবাসী যারাই আছেন তারা সবাই এক, তারা ভারতবাসী।

আর এ শুধু কথার কথা নয়, এটাই চরম সত্য। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তাকে সঠিকভাবে লালন করতে যে পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রয়োজন তাই-ই ভারতের দৃষ্টি। যে দৃষ্টি অন্য কারোর কাছে নেই।

এই যে আমরা বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে আমাদের অন্তর নিরীক্ষণ করে আত্মার মূল্যায়ন করা শুরু করেছি, আজকের দিনে বিজ্ঞান কিন্তু সেই সীমারেখা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজকের বিদ্বানরা তেমনটাই বলছেন, Everything started with pre-existing universal consciousness। এতকাল জড়তা স্থবিরতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানে বলা হয়েছে, চৈতন্যের জন্ম হয় জড়তা থেকেই এবং এতকাল ধরে তাই-ই হয়ে আসছে। আগের ধারণা ভ্রান্ত। এ সমস্ত বিষয়ই বিজ্ঞানের থিয়োরি ভিত্তিক গবেষণা। বিজ্ঞানের অনুভূতিতে এ জিনিস পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জ্ঞান, অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করেন। তাঁদের জন্য অবশ্য কোনো বিজ্ঞাপন এজেন্সি নেই। কিন্তু তাঁরা আছেন। কদাচিৎ তারা সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসেন।

এখন আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে, ভারতের এই বিস্মৃত অস্মিতাকে পুনর্জাগরিত করতে হবে। এসব কথা তো আগেই হয়ে গেছে, এখন কথা হচ্ছে যে আমরাও কিন্তু এই ভুলে ভরা সংস্কৃতিতেই বড়ো হয়েছি, যার কারণে আমরাও কিন্তু এই জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছি। সেই কারণেই আমরা বলি ভারতের তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত। এখন আমাদের ভাবনা বদলাতে হবে। এই কথা উলটে আমাদের ভাবতে হবে যে, বিজ্ঞান ভারতের তত্ত্বজ্ঞানের অনুসারে এগিয়ে চলেছে। আজকাল বিদ্বান লোকেরা জিজ্ঞেস করে, ধর্ম কি বিজ্ঞানসম্মত? কিন্তু সেদিনও আসছে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করবে, বিজ্ঞান কি ধর্মসম্মত? ধরা যাক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। বিজ্ঞানীরা বলছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরি। তার কাজ তো বিজ্ঞান মেনে চলে, কিন্তু তার এথিক্স? এথিক্সের কথা তো প্রথমেই আসা উচিত! তার চিন্তাশক্তি? সেটা কার হাতে?

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তি পরেষাং পরিপীড়নায়।

খলস্য সাধোরঃ বিপরীতমেতদ্ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।।

অর্থাৎ দুষ্টের জ্ঞান বিবাদের জন্য, সম্পদ উন্মত্ততার জন্য এবং ক্ষমতা অপরকে পীড়ন করার জন্য। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁদের জ্ঞান, দান এবং অন্যকে রক্ষার জন্য ব্যবহার করে। সুতরাং শঠতা ও সাধুতার মধ্যে পার্থক্য কী? সাধনা সকলের জন্যই কিন্তু সিদ্ধিলাভ করে কজন? বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ যে করছে তার বুদ্ধি কেমন? হৃদয় কেমন? এই বুদ্ধি আর হৃদয় গঠন করার কাজেই প্রয়োজন ভারতীয় বিচারবোধের। এখনও যে এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে, তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই বিচারবোধের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই।

আমাদের সংস্কৃতিতে 'Hate', 'We don't believe' এই শব্দগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমরা স্বীকার করি, অবশ্য তা ভালোভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি তো বলছেন বটে, কিন্তু আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে যান।

কিন্তু তার জন্য কঠোর তপস্যা প্রয়োজন। সেই তপস্যাই আমাদের করতে হবে। আমাদের এখন দশটি কাজ করতে হবে। তা আমাদের নিজেদের দিয়েই শুরু করতে হবে। সারা বিশ্বের ভালো বিষয়গুলি অবশ্যই আমরা নেব। আমাদের সংস্কৃতিতে বহু বিকৃতি এসেছিল। হতে পারে সেই সময়কালের কোনো এক অধ্যায়ে বস্তুবাদের লক্ষ্যে ভারত মেতে উঠেছিল। সেই কারণেই ভারতে একাধিক যোগ্য বাস্তুকার থাকা সত্ত্বেও রাজপ্রাসাদ তৈরি করার জন্য মায়াসুরের মতো বাস্তুকারকে মেক্সিকো থেকে ডেকে আনতে হয়েছিল যুধিষ্ঠিরকে।

এটা কোনো উদ্ধৃতি নয়, একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা মাত্র। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, নির্মাণ যতই নতুন রূপে, নতুন বস্ত্রে সাজানো হোক, চৌকাঠ কিন্তু নিজের হবে। তাতে আত্মা সেই একই থাকবে এবং কাজও সেই সনাতন তত্ত্ব অনুযায়ীই হবে। এজন্য একটি যুগানুকূল রূপ দিতে, শাশ্বত ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী আমাদের অন্তরে মূল্যবোধের সিঞ্চন করতে হবে। সেই কারণে আমাদের সবাইকে শেকড়ের দিকে ফিরে গিয়ে মূল বিষয়টি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে যথাযোগ্য জ্ঞান অর্জন করে সেই চৌকাঠে গিয়ে বসতে হবে অর্থাৎ দেশের সংস্কৃতিকে সুরক্ষা দিতে হবে যাতে বিকৃতি প্রবেশ না করে। আমাদের মধ্যে অবশ্য এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা এই কাজের জন্য যথোপযুক্ত, কিন্তু বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে একথা ভাবতে হবে। বাইরে থেকে প্রশ্নবাণ আসবে, আর আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বসব এমন খেলা আমরা আর খেলতে বসব না। কারণ আমরা জানি বাস্তবে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিকভাবে আমাদের জয়লাভ

হয়ে গেছে। অবশ্য হেরে যাওয়ার পরেও হার স্বীকার না করতে শঠতা অবলম্বন করা, দুর্বাক্য প্রয়োগ করা ইত্যাদি বহু কিছুর অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। কিন্তু আমরা জিতে গেছি এটাই সত্যি।

সারা পৃথিবী বিগত দু'হাজার বছরে এক অস্থির অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে। আস্তিক-নাস্তিক, ব্যক্তিবাদী-সমাজবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার মানুষ প্রচুর বাদানুবাদ, যুক্তি, তথ্য প্রয়োগ করেও অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। সুতরাং তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় আমাদের নেই। তাদের জমিতে গিয়ে আমাদের কবাডি খেলতে হবে নাকি, তাদের নিয়মানুসারে? কখনোই না। বরং সারা বিশ্বকে আমাদের জমিতে নিয়ে আসতে হবে এবং খেলা হবে আমাদের নিয়মানুসারে। এই ভাবনাতেই আমাদের তন্ময় হয়ে থাকতে হবে। আমাদের উপলব্ধিও একইভাবে হতে হবে। এ সত্য এমনটাই যে, আধিভৌতিক জ্ঞানসমূহ তন্ময়তা থেকেই প্রাপ্ত হয়। সেই তন্ময়তা আবার আত্মীয়তা থেকেই আসে।

আমাদের নিজের থেকে এসব শুরু করতে হবে। গ্রামে জঙ্গলে গিয়ে লোকমন্থন করতে হবে। ছোটো ছোটো দল গঠন করে অরণ্যে গিয়ে অরণ্যবাসীদের সঙ্গে বসে বৈঠক করতে হবে। এক পঙ্‌ক্তিতে তাদের সঙ্গে বসতে হবে। আমরা প্রশ্ন করব, তারা উত্তর দেবেন। আর জিজ্ঞেস করতে হবে শ্রদ্ধাভরে। শ্রদ্ধয়া প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণিপাত সহকারে সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করে সেবাদান করতে হবে। লোকের কাছে যেতে হবে। তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। এখানে বহু কর্মপ্রবণ গুণীজন উপস্থিত আছেন যারা অবিরাম এই সমস্ত কাজের মধ্যে থেকেই তাদের মাঝে যাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে মিশছেন।

এখন কিন্তু ভারতের প্রভাব বাড়ছে। ভারতকে উঠে দাঁড়াতে হবে। ভারতকে বড়ো হতে হবে। তাই বৃহৎ সমাজকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। সঠিক শব্দে বিষয়টি প্রকাশ করতে পারলে এই কাজ আমাদের সম্পূর্ণ হবেই এতে কোনো ভুল নেই। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই বিশ্বে কেউই আমাদের শত্রু নয় এবং আমরাও কারুরও শত্রু নই।

হ্যাঁ। এক সময় আক্রমণকারীরা আমাদের অনেক ক্ষতি করে গেছে। কিন্তু আমরা এখন পড়ে পড়ে মার খাব না। আমরা এর প্রতিকার করব, লড়াই করব। কারুর যদি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়, পরীক্ষা করতেই পারে। কিন্তু আমরা তো কারোর সঙ্গে লড়াই করতে যাই না।

কেরালায় উদয়নন্দ নামে এক রাজকুমারের পিতা তাকে রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে চয়ন করেন। প্রজা সুরক্ষার বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মহর্ষি পরশুরামের প্রতিষ্ঠিত এক গুরুকুলে পাঠান অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য। সেখানে ২১ জন আচার্য শিক্ষাদান করতেন। সেখানে ১২ বছর শিক্ষা সমাপন্তে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রধান আচার্যের সামনে উপস্থিত হয়। আচার্যদেব জিজ্ঞেস করেন বারো বছরে কী শিখেছ? উত্তরে সে জানায়, আমি একা দশ হাজার লোকের সঙ্গে লড়তে পারব। গুরুদেব পরেরদিন আসতে বলেন। রাত্রে সে চিন্তা করে সংখ্যাটা বোধ হয় বেশিই বলে ফেলেছি। তাই পরেরদিন সে উত্তর দেয় আমাকে যারা ঘিরে থাকবে তাদের সকলকে মারতে পারব, প্রায় ২৭ জনকে। গুরুদেব বলেন, তোমার চিন্তাভাবনার উন্নতি হচ্ছে, তুমি কাল এসো। পরদিন সে বলে, আমি এক সময় তো একজনের সঙ্গেই লড়াই করতে পারব। ক্রমেই তার উত্তর পরিবর্তন হতে থাকে। একদিন গুরুদেবকে জানায় আমার শিক্ষা কেবল লড়াই করার জন্য নয় বরং প্রজাদের রক্ষা করার জন্য।

তেমনই আমাদের বিমর্শ ইতিবাচক বিষয়ের ওপর নির্মাণ করতে হবে। হেরে যাওয়া বিশ্বের বা মতাদর্শের হয়ে কথা বলা মানুষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমাদের স্বজনদের বোঝানোর জন্য যতখানি প্রয়োজন ততখানিই বিমর্শের মাধ্যমে উত্থাপন করতে হবে। বিরোধী শক্তির মতাদর্শের ক্ষতিকর দিকগুলি বারবার বলার প্রয়োজন নেই শুধু দুটি জায়গা ছাড়া। প্রথম, যদি কারও মনে নেতিবাচক ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে তার সম্পূর্ণরূপে বের করার জন্য। দ্বিতীয়, কারও জীবনে বিরোধী শক্তির মতাদর্শের কারণে ক্ষতিকর পরিস্থিতি রোধ করতে। এই দুটি জায়গা ছাড়া কে ভুল, কী ভুল, এইসব দ্বন্দ্বে না গিয়ে যা সঠিক, তা যুক্তির ভিত্তিতে সুযোগ অনুযায়ী প্রকাশ্যে নিয়ে আসা। এভাবেই আমাদের বিমর্শ তৈরি করতে হবে। আজ সারা বিশ্ব অপেক্ষায় রয়েছে, কারণ বিশ্বের অন্য দেশগুলির নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, তা সত্ত্বেও ভারত সম্পর্কে একটি গভীর আগ্রহ রয়েছে। তাই তারা ধৈর্য ধরে ভারতবর্ষের পরিবর্তন গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে। সমাজে যখন ব্যাপক জাগরণ আসে তখন সেই সমাজের পরিধি ঘিরে বাইরের মানুষের কৌতূহল বাড়ে বই কী। বহু বিদ্বান ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসেন। বহমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সমস্ত কিছু দেখে শুনে তারা অভিভূত হয়ে ফিরে যান। তাদের কৌতূহল অনেক বেশি, কারণ তারা ভারতবর্ষের পথেই চলতে চান। ভারত যাতে সঠিক দিশায় অগ্রসর হতে পারে সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করে যেতে হবে। সঠিক তথ্য ও সময়োপযোগী যুক্তির ভিত্তিতে সঠিক বিমর্শের জন্য প্রয়োজন 'মন্থন'। মন্থনে উঠে আসবে অমৃত, সেই অমৃত আমরা সবাইকে দান করব। মনে রাখতে হবে, একই সঙ্গে হলাহলও উৎপন্ন হবে। কিন্তু যারা নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মোহের চিতা জ্বালিয়ে, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে দেশের স্বার্থে ঘর ছেড়েছেন, তারা শিবরূপে সেই হলাহল পান করে আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন। এমন অবতার আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃপায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যমান । তাঁরা আছেন বলেই এ বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে। তাঁরা নিঃশব্দে সেই বিষপান করে চলেছেন। আমাদের কাজ শুধু মন্থনের মাধ্যমে অমৃত উৎপন্ন করে সমাজকে প্রদান করা। মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ভারতকে অমরত্ব প্রদান করে 'অমর ভারত' তৈরি করার জন্য আমাদের সঠিকভাবে মন্থনের কাজ করে যেতে হবে।

(ভাগ্যনগরে অনুষ্ঠিত লোকমন্থনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের ভাষণের সারাংশ)

শুদ্ধি আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৮৫৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের জলন্ধর জেলার তালওয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন যুক্ত প্রদেশে (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) পুলিশ পরিদর্শক। প্রথমে তার নাম দেওয়া হয় বৃহস্পতি বিজ, কিন্তু পরবর্তীতে মুন্সীরাম বিজ নাম রাখা হয়। ১৯১৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় শ্রদ্ধানন্দ। বরেলিতে এক ধর্মীয় বক্তৃতাসভায় দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দয়ানন্দজীর বক্তব্যে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে আর্য সমাজের কাজে অগ্রণী হন।

শ্রদ্ধানন্দ আইনজীবী পেশা ছেড়ে পঞ্জাব আর্য সমাজ গঠন করেন। আর্য সমাজ গুরুকুল বিভাগ এবং ডিএভি বিভাগের মধ্যে বিভক্ত ছিল। শ্রদ্ধানন্দ গুরুকুলের পক্ষে থাকেন এবং ১৮৯৭ সালে লালা লেখরামের পর তখন শ্রদ্ধানন্দ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি 'পঞ্জাব আর্য প্রতিনিধি সভা'-র নেতৃত্ব দেন এবং এর মাসিক পত্রিকা আর্য মুসাফির শুরু করেন। ১৯০২ সালে তিনি হরিদ্বারের কাছে ভারতের কাঙ্গড়ীতে একটি গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলটি এখন গুরুকুল কাঙ্গড়ী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। হরিয়ানার ফরিদাবাদের কাছে আরাবলিতে গুরুকুল ইন্দ্রপ্রস্থ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৭ সালে, শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু সংস্কার আন্দোলন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্য গুরুকুল ত্যাগ করেন। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একমাত্র হিন্দু সন্ন্যাসী যিনি জাতীয় সংহতি এবং বৈদিক ধর্মের জন্য জামে মসজিদের প্রধান মিনার থেকে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। বেদমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে তিনি বক্তৃতা শুরু করেন।

তিনি হিন্দি এবং উর্দু উভয় ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি দুটি ভাষায় সংবাদপত্রও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি প্রচার করেন, দরিদ্রদের সাহায্য এবং নারী শিক্ষার উন্নতি করেন। ১৯২৩ সালে শুদ্ধি আন্দোলনের (হিন্দুধর্মে পরাবর্তন) কাজে নিবিষ্ট হন, যার

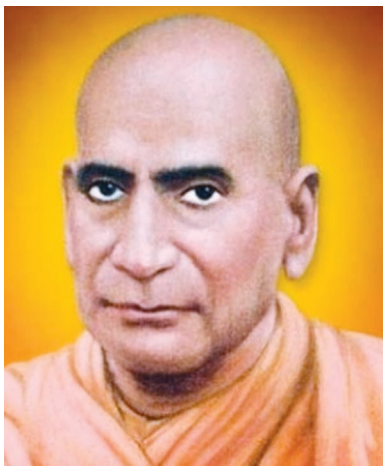

কারণে তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হন। ১৯২২ সালে ড. আম্বেদকর শ্রদ্ধানন্দকে 'অস্পৃশ্যদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে আন্তরিক বীরপুরুষ' বলে অভিহিত করেন। ১৯২৩-এর শেষের দিকে, তিনি ভারতীয় হিন্দু শুদ্ধি সভার সভাপতি হন। তিনি বলপূর্বক ধর্মান্তরিত মালকান রাজপুতদের সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই আন্দোলনের কারণে ১,৬৩,০০০ জন মালকান রাজপুত পুনরায় ইসলাম ছেড়ে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী শুদ্ধি আন্দোলনের কারণে জেহাদিদের রোষানলে পড়েন। ১৯২৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর আব্দুল রশিদ নামে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে গান্ধীজী ২৫ ডিসেম্বর কংগ্রেসের গুয়াহাটি অধিবেশনে একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সাভারকরের ভাই নারায়ণরাও ১৯২৭ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে বোম্বে থেকে শ্রদ্ধানন্দ নামে একটি সাপ্তাহিক শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। স্বাধীনতার পর দিল্লি টাউন হলের সামনে ঘণ্টাঘর নামক জায়গায় রানি ভিক্টোরিয়ার মূর্তি সরিয়ে শ্রদ্ধানন্দের মূর্তি স্থাপন করা হয়।

জনবিন্যাস বদলে দিয়ে ভারতের অখণ্ডতাকে নষ্ট করার চক্রান্তকে সফল ভাবে আটকে দেওয়ার জন্য সনাতনের ইতিহাসে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ

সুদীপ্ত গুহ

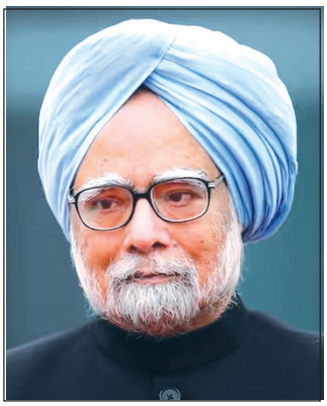

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, নয়াদিল্লিতে প্রয়াত হলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মনমোহন সিংহ। অর্থনীতির নানা বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার পাশাপাশি ২০০৪ থেকে ২০১৪— প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই দশ বছরের শাসনকাল দেশবাসী স্মরণে রাখবে ১০০ দিনের কাজ, ন্যাশনাল রুরাল হেলথ্ মিশন, তথ্য জানার অধিকার আইন (আরটিআই), ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি, খাদ্য সুরক্ষা আইন বা ইউআইডিএআই (আধার-কর্তৃপক্ষ) স্থাপনের মতো একাধিক কাজের কারণে। যদিও এই ধরনের কিছু ভালো কাজকে ছাপিয়ে যায় তাঁর সরকারের মেরুদণ্ডহীনতা, সীমাহীন দুর্নীতি, চরম অব্যবস্থা ও হিন্দু-বিরোধিতা। তিনি ছিলেন ১০ জনপথের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ। প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউপিএ সরকারের 'অন্তরাত্মা' বা ইউপিএ চেয়ারপার্সনের নির্দেশের অপেক্ষায় তাঁকে থাকতে হতো। তাঁর ফাইল একজন নিয়মিত নিয়ে যেতেন ইউপিএ চেয়ারপার্সনের কাছে। ইউপিএ চেয়ারপার্সন ছিলেন ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের মধ্যমণি এবং কতিপয় আরবান নকশাল পরিবেষ্টিতা। সেখান থেকে ফাইলবন্দি হয়ে আসা নির্দেশ ড. মনমোহন সিংহ কার্যকর করতেন। তথ্যসূত্র সঞ্জয় বারুর লেখা একটি বই। ড. সিংহের মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারুর ভাষায় তিনি ছিলেন 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার'।

সারা জীবনেও ১৯৮৪-র শিখ গণহত্যার প্রতিবাদে একটা টুঁ-শব্দও করেননি। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি বলেছিলেন যে, এই দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার মুসলমানদের। তাঁর আমলে দেশকে সহ্য করতে হয়েছে মুম্বই হানা-সহ একের পর এক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। দেশ বার বার পাক-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের হাতে রক্তাক্ত হলেও 'পাকিস্তানও সন্ত্রাসবাদের শিকার' ইত্যাদি বলে পাকিস্তানের অপরাধ তিনি কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। কাশ্মীরের গণহত্যাকারী জঙ্গি ইয়াসিন মালিকের সঙ্গে একই ফ্রেমে তাঁর ছবি একজন সাধারণ ভারতীয়ের মনে যেন বিবমিষার উদ্রেক করে। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে এমন একটি আইন আনার চেষ্টা করছিলেন যাতে যে কোনো দাঙ্গার ক্ষেত্রে হিন্দুরাই একমাত্র দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। সংসদে দাঁড়িয়ে 'হিন্দু টেরর' কথাটি উল্লেখ করে সমগ্র হিন্দুসমাজকে অসম্মানও করেছিলেন। ওয়াকফ আইন এমনিতেই ভারতীয় সংবিধান-বিরোধী একটি আইন। তাঁর শাসনকালে সেই আইনটিতে একটি সংশোধনী এনে আইনটির ক্ষমতা এমনভাবে বৃদ্ধি করেন যাতে ওয়াকফ বোর্ড দেশের যেকোনো জমিজমারই দখল নিতে পারে। তাঁর আমলে টুজি, কয়লা, কমনওয়েলথ, আদর্শ হাউজিং সোসাইটি, অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার চুক্তি দুর্নীতি, দেবাস-অ্যান্ট্রিক্স কেলেঙ্কারি, নেহরু পরিবারের জামাইয়ের জমি কেলেঙ্কারি-সহ অসংখ্য আর্থিক কেলেঙ্কারি সামনে আসে। তাঁর আমলে দিল্লির বুকে হয় নির্ভয়া হত্যাকাণ্ড, কংগ্রেস ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় একটি গোপন চুক্তি। তাঁর নেতৃত্বাধীন চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সংঘটিত হয় ব্যাপক প্রতিবাদ, আন্দোলন। দুর্নীতির প্রবাহ তাঁর আমলে অব্যাহত থাকলেও সেই বিষয়ে তিনি ছিলেন সদা মৌন।

তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত, কিন্তু কখনও নিজের ইচ্ছায় কাজ করেননি। সারা জীবন যখন যে বস, তখন তাঁর কথা শুনেছেন। ১৯৯১-এর সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করেছেন বটে, কিন্তু ওই সংকটের অন্যতম কারণ তো তিনিই। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬— তিনি দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৭৪ সালে দেশের মুদ্রাস্ফীতি ছিল সর্বোচ্চ। ১৯৭৫ সালে দেশের বেকারত্ব ছিল সর্বোচ্চ।

২০২০ সালে কোভিডের সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে যে ৪৫ বছরের সর্বোচ্চ বেকারত্বের গল্প শুনতে হয়েছে, ৪৫ বছর আগের সেই সময়টা ছিল '১৯৭৫'। পার্থক্য এই যে, ২০২০-তে ছিল কোভিডের অভিশাপ, আর ১৯৭৫-এ কেজিবির আশীর্বাদ।

তিনি ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সালে যোজনা কমিশনের প্রধান। ইতিহাস বিকৃতির অন্যতম উদাহরণ হলো ১৯৯১-এর আর্থিক সংস্কারের জনক হিসেবে ড. মনমোহন সিংহকে স্বীকৃতি দেওয়া। যেহেতু ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬— নেহরু পরিবারকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হতে দেননি নরসিংহ রাও, তাই এই কৃতিত্ব মনমোহনকে দেওয়া। অথচ, ১৯৯১-এর আগে ড. মনমোহন সিংহ কীভাবে দেশকে দেউলিয়া হওয়ার পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর আশীর্বাদে, তা নিয়ে কোনো গবেষণা এখনও হয়নি। ২০১৬ সালে তিনি সংসদে বলেন যে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। তিনি সারা জীবনে এত বড়ো বড়ো পদে বসেছেন যেখানে জওহরলাল নেহরুও বসেননি। সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিযোগ কি আদতে নিজেরই বিরুদ্ধে? তিনি এর দায় ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। ২০১৪ পর্যন্ত দেশের বড়ো সংখ্যক মানুষ ব্যাংক, বিমা, লোন ইত্যাদি সুবিধা থেকে দূরে ছিল। যাঁরা এই কাজ করলেন তাঁরা হলেন বামপন্থী, আর যাঁরা দেশের বিপুল সংখ্যক নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের ব্যাংকিং-ইন্সুরেন্সের আওতায় ২০১৪ পরবর্তী পর্যায়ে আনলেন তাঁরা বুর্জোয়া?

তবে একথা ঠিক যে, তিনি দেশের অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৯১-এর আর্থিক সংস্কার এমনই একটা কাজ, যা তাঁকে ইতিহাসে একটা জায়গা করে দেবে। নেহরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতি যে একটা ভয়ংকর মিথ্যা, তা এই পর্যায়ে প্রমাণ করে ছেড়েছে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর তৎকালীন বস নরসিংহ রাওয়ের নির্দেশে সেই মিথ্যাকে কবর দিয়ে দেশকে কিছুটা রক্ষা করেন ড. সিংহ। এই পাঁচ বছরের কাজের জন্য দেশ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, কিন্তু প্রশ্ন তুলবে প্রথম এবং তৃতীয় পর্বের অপকর্মের জন্য। □

ঢাকায় আয়োজিত আলোচনাসভায় উঠল সবার অধিকার সুনিশ্চিত করে এমন সংবিধানের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামীদিনে দেশের সব মানুষের অধিকার যেন সুনিশ্চিত হয়—এমন সংবিধান তাঁরা চান বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর। গত ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ আয়োজিত 'ঐক্য, সংস্কার ও নির্বাচন'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভায় এ কথা জানান তিনি।

তাঁর বক্তব্যে বাসুদেব ধর বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হলেও পরে সেটি আর সবার সংবিধান হয়ে ওঠেনি। আমরা সব মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করে এমন সংবিধান ও দেশ চাই। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা 'এক পরিবার'-এর কথা বলেছেন। আমরাও 'এক পরিবার' চাই। এ দেশে আমরা সবাই 'এক পরিবার' হয়ে বসবাস করতে চাই।

তিনি বলেন, একটি ঘটনা ঘটলে সেটিকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা যেমন অন্যায়, আবার সেটা অস্বীকার করার প্রবণতাও আমরা লক্ষ্য করছি, সেটাও ঠিক নয়। আমরা কোনো ঘটনায় অতিরঞ্জিত কোনো কিছু যেমন চাই না, তেমনই সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে, সেটাও চাই না। ঘটনা সেটা যেভাবেই ঘটুক, জড়িতদের ধরতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এধরনের ঘটনা না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। যথাযথভাবে এসব ঘটনা চিহ্নিত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, হামলার ঘটনা বন্ধ হবে না। গত ৫৩ বছর ধরে দেশে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটছে, কিন্তু কোনো ঘটনারই বিচার হয়নি।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বলেন, দেশে অতীতের নির্বাচনগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভোট দিয়েও মার খেয়েছে, না দিয়েও মার খেয়েছে। তাই আমরা ভবিষ্যতে এমন নির্বাচন চাই না, যেটা আমাদের জন্য নতুন করে নির্যাতন-নিপীড়ন বয়ে আনে।

কলকাতায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদযাত্রা, সমাবেশ, ধরনা ও অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৭ ডিসেম্বর 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ-২০১৬'-র ডাকে দুপুর ১২টায় কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে শুরু হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জমায়েত। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা এসএলএসটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্যানেলটিকে গত বছরের ২২ এপ্রিল বাতিল বলে ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সেই রায়টিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্যানেলভুক্ত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন সেই প্যানেল হতে নিয়োজিত, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা শিয়ালদহে জমায়েতের পর ন্যায়বিচারের দাবিতে শিয়ালদহ হতে ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। পদযাত্রা শেষে ধর্মতলায় শুরু হয় তাদের সমাবেশ ও ধরনা। বর্ধমান, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষকদের এই পদযাত্রা সমাবেশ ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। সমাবেশে তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষকরা বলেন, বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগ কমিটি এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই প্রদত্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে নবম-দশম শ্রেণীতে শিক্ষক পদে নিয়োজিত প্রার্থীদের মধ্যে ৮.৫ শতাংশ এবং একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণীতে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে ১৪.৪৭ শতাংশ প্রার্থী অবৈধভাবে নিযুক্ত। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্তদের সেই তালিকায় তাঁদের নাম নেই। যে ১৭ দফা অনিয়ম তুলে ধরে কলকাতা হাইকোর্ট এই প্যানেল বাতিল করে, সেই অনিয়মের অভিযোগ যোগ্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে করেনি কোনো তদন্তকারী সংস্থা। তাঁরা বলেন যে নবম-দশম শ্রেণীর প্রায় ৯২ শতাংশ শিক্ষক এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ৮৬ শতাংশ শিক্ষক তাঁদের স্বীয় যোগ্যতায়, স্বচ্ছভাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

এরপর ওয়াই চ্যানেল চত্বরে শুরু হয় তাঁদের অবস্থান-বিক্ষোভ। স্লোগানের মধ্য দিয়ে তাঁরা দাবি জানাতে থাকেন যে যোগ্য শিক্ষক- শিক্ষিকাদের চাকরি বহাল রাখতে হবে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের শাস্তি দিতে হবে। টাকার বিনিময়ে যারা এই দুর্নীতি করেছে, তাদের সঙ্গে রাজ্য সরকার এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনকে তারা তীব্র ধিক্কার জানান।

শোক-সংবাদ

বারুইপুর জেলার স্বয়ংসেবক তথা সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিজয় আঢ্যের অনুজ পঞ্চানন আঢ্য গত ২৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, এক দাদা, এক ভাই এবং তিন বোন রেখে গিয়েছেন।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট খণ্ডের গোপালপুর শাখার স্বয়ংসেবক হরেন্দ্রনাথ মাহাত গত ৩০ ডিসেম্বর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, দুই পুত্র ও এক কন্যাকে রেখে গিয়েছেন। তিনি ২৫ বছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা রূপে কাজ করেছেন। তাঁর দুই পুত্রই স্বয়ংসেবক।